প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

ক. পৃথিবীর সর্প পূজা মুখ্য অঞ্চল

ইতিহাসের প্রত্যূষ কাল হইতে অলৌকিক শক্তিরূপে সর্প পূজা চলিয়া আসিতেছে গ্রীষ্মপ্রধান প্রায় সমস্ত দেশে। মানুষের নিকট এই পূজা ক্রমে স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। সর্প অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির হইলেও ইহা মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। প্রাচীন সর্প পূজার বিক্ষিপ্ত নজির অনেক অঞ্চলে পাওয়া যায়। অজগর সর্পকে কেন্দ্র করিয়া আফ্রিকায় বিশেষ ধরণের সর্প পূজা প্রচলিত ছিল। আবিষ্কারকগণ আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে পদার্পণ করিবার সময় তথায় সর্প পূজার প্রচলন দেখেন। আফ্রিকান সর্প-পূজা বিশারদ বলেন –

" The most fundamental ideas of all kinds of African snake belief are those of resurrection and fecundity."[১]

তিনি আরও বলেন –

" Here there are sacred cows for supplying milk to the Python. The rites by which the royal dead pass into Pythons are well established. There is clear evidence respecting the supplications of childless people."[১]

অজগর পূজা ক্রমে এই মহাদেশের দাহোমে এবং নাইজিরিয়ায় প্রসার লাভ করে। আর অজগর সর্পকে তাহারা প্রভু, মাতা এবং উপকারী বন্ধু মনে করিত।[২] অজগরদের সহিত মৃত্তিকার উর্বরতার একটি সম্পর্ক আছে। সেইজন্য ঐ দেশে অজগর মারা নিষিদ্ধ ছিল। আইন অমান্য করিলে কঠোর শাস্তি হইত।

Whydah এবং Dahomey তে সর্পদেবতা Danh-gbi পূজিত হইতেন। পুরোহিতগণ তাঁহার পূজা করিতেন। সুন্দরী নারী Danh-gbi -র বধূ প্রিয় ছিল। বৃষ্টি আনয়ন করিবার জন্য মৃৎপাত্র লইয়া নারীগণ বৃত্তাকারে Danh-gbi র মন্দিরে নৃত্য করিত।

ক্রীতদাসগণ পশ্চিম আফ্রিকা হইতে হাইতি গেলে তাহাদের ধর্মও সঙ্গে গিয়াছিল এবং তাহা Voodoo আকার গ্রহণ করিয়াছিল । ইহা অবশ্য সর্পপূজা ছাড়া আর কিছুই নহে । Dahomey র সর্পদেবতা Damballah-wedo নামে পূজিত হইতেন । Voodoo ও সর্পপূজা । পূজক একটি খাঁচার মধ্যে একের পর এক জীবিত সর্প ছাড়িয়া দিত । খাঁচার বাহির হইতে ভক্তগণ মনের বাসনা জানাইত । তখন পুরোহিত ভবিষ্যৎবাণী করিতেন । দেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ছাগবলি দান করা হইত ।

খ. মনসা-মঙ্গল কাহিনীর বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

হিন্দুর দেবদেবীর উৎপত্তির মূল অন্বেষণ করা অত্যন্ত দুরূহ কার্য । মনসা দেবীর উদ্ভব বৃত্তান্ত সম্পর্কে যতটা জানা যায় তা এই প্রকার । মনসা দেবী বৈদিক দেবী নহেন, এমন কি মহাভারতেও মনসা নামটি পাওয়া যায় না ।

ঋক্ বেদে সর্পপূজার উল্লেখ নাই, সর্পাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামও নাই । সর্প শব্দের ব্যবহার আছে, তাও ব্যবহৃত হইয়াছে ইন্দ্রের শত্রু বৃত্রকে বুঝাইবার জন্য । যজুর্বেদে সরিসৃপ অর্থে সর্প শব্দের ব্যবহার হইয়াছে ; কিন্তু তাহাতেও সর্পপূজার উল্লেখ নাই । অথর্ব বেদের যুগে সর্পকে অনিষ্টকারী জীব হিসাবে উল্লেখ করিয়া তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে মন্ত্র রচিত হইয়াছিল ।

সর্বপ্রথমে গৃহ্যসূত্র সমূহে ইতস্তত: সর্পপূজার উল্লেখ পাওয়া যায় । তাহাতে এক স্থানে বলা হইয়াছে যে শ্রাবণ পূর্ণিমা হইতে বর্ষার চারিমাস সর্পভয় থাকার জন্য মানুষকে মৃত্তিকায় শয়ন না করিয়া উপরে শয়ন করিতে হইবে । আবার অগ্রহায়ণ পূর্ণিমার দিন হইতে ভূমিতে শয়ন করা যাইতে পারে ।

শ্রাবণী পূর্ণিমায় সর্পের উদ্দেশ্যে শ্রাবণ যজ্ঞ নামে একপ্রকার যজ্ঞ নিষ্পন্ন হইত । ইহা ক্রমে ক্রমে লোপ পাইয়া শেষে শ্রাবণের নাগপঞ্চমী পূজাতে দাঁড়ায় এবং তাহা এখনও প্রচলিত । ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে আর্যগণের ভারতে আগমনের সময় তাঁহাদের মধ্যে সর্পপূজার প্রচলন ছিল না । কিছুকাল অবস্থানের পর সর্পভয়ে ভীত হইয়া প্রাগার্য ভারতীয়গণের নিকট হইতে সর্পপূজা করেন ।

প্রাগার্য্য অধিবাসিগণের মধ্যে দ্রাবিড় ভাষাভাষী মানুষই ছিল প্রধান । তাঁহারাও সর্পপূজক ছিলেন কাজেই দ্রাবিড়গণের নিকট হইতে আর্যগণ সর্পপূজা শিখিয়াছিলেন একথা ভাবিবার যুক্তি আছে । আসামের কিরাতগণ প্রাগার্য্য অধিবাসী তাহাদের মধ্যেও একপ্রকার সর্পপূজা প্রচলিত ছিল ।

এই স্থানে উল্লেখযোগ্য যে উত্তর ভারত, মধ্য ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের সর্পপূজার সহিত পূর্বভারতের অর্থাৎ বিহার, বঙ্গ ও আসামের সর্পপূজার পার্থক্য আছে । উত্তর ভারত ও মধ্য ভারতের সর্পপূজার উপাস্য দেবতা হইলেন নাগরাজ বাসুকি, নাগমাতা পদ্মাবতী নহেন । আর তাঁহার পূজা হয় সরীসৃপ মূর্তিতে । দক্ষিণ ভারতে জীবন্ত সর্পই পূজার উদ্দিষ্ট । আসাম, বঙ্গ ও বিহারে সর্পাধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসা নামে পরিচিতা, আর তাঁহাকে নারী মূর্তিতে উপাসনা করা হয় ।

মনসার একাধিক নাম আছে, যেমন বিষহরী, জাঙ্গুলী পদ্মাবতী, নাগেশ্বরী, নাগমাতা ইত্যাদি । বিষহরী বা মনসাপূজা স্থানভেদে ঘটে এবং মাটির মূর্তি বা মণ্ডপে সম্পন্ন করা হয় । ঘট আবার বহু প্রকার দেখা যায়, যেমন সাধারণ ঘট, অষ্টনাগ, পঞ্চনাগ বা নবনাগ ঘট ইত্যাদি । বঙ্গদেশের হাওড়া, হুগলি, চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে ঘট বা মূর্তির স্থলে সীজ বৃক্ষে পূজা করা হয় । আসামেও ঘটের নিকটে সীজ বৃক্ষের শাখা রোপণ করিয়া পূজা করা হয় । বঙ্গদেশে অবশ্য সীজ বৃক্ষের অন্য নাম মনসা ।

বৃক্ষের সহিত সর্পের সম্পর্ক অতি প্রাচীন ও অর্থব্যঞ্জক । সর্প শীতে বৃক্ষের কোটরে বা বৃক্ষের নিম্নে গর্তে বাস করে আর গ্রীষ্মে বৃক্ষে বা বৃক্ষের শাখায় পাক দিয়া থাকিয়া আরাম পায় । বৃক্ষ ও সর্প উভয়ই উর্বরতার প্রতীক । বৃক্ষপূজা ও বৃক্ষ বিবাহ অসমীয়া ও বাঙ্গালীর নিকট নূতন কথা নহে । এই পূজার মাহাত্ম্য সম্পর্কেও অনেক জনশ্রুতি আছে । দাক্ষিণাত্যে সীজ বৃক্ষের স্থলে অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে মৃত্তিকা বা প্রস্তর নির্মিত নাগ মূর্তি স্থাপন করিয়া পূজা করা হয় । সেখানে লোকবিশ্বাস আছে যে বন্ধ্যা নারী ঐরূপ শিলামূর্তি স্থাপন করিয়া পূজান্তে ১০৮ বার প্রদক্ষিণ করিলে সন্তানসম্ভবা হন ।

উত্তরবঙ্গ ও আসামের বড়োগণ ইন্দোমঙ্গলীয় জাতির একটি শাখা। প্রাগার্য্য জাতিগণের ভিতরে বড়ো জাতি অন্যতম। তাঁহারা সীজ বৃক্ষকে গৃহদেবতা বা বাথৌরের প্রতীকরূপে তাহাতে পূজা করে। সীজবৃক্ষ মনসা পূজার অপরিহার্য্য অঙ্গ। গারোগণও মনসা-সীজকে জীবন্ত দেবতারূপে পূজা করে। আসাম ও বঙ্গদেশে এই মনসা-সীজের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত মনসাপূজা ব্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। দুধ সর্পের প্রিয় পানীয় আর সীজবৃক্ষের রসেও দুধের মত সাদা আঠা আছে। ইহা সর্পবিষনাশক আর সেইজন্যই সর্পাধিষ্ঠাত্রী মনসাদেবীর সহিত ইহার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে যাওয়া অসম্ভব নহে। দাক্ষিণাত্যে পানাগাছ নামে দুগ্ধস্রাবী একপ্রকার গাছ সর্পাধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করিয়া পূজা করা হয়।

উত্তর ও মধ্য ভারতের সর্পদেবতা পুরুষ (বাসুকি) আর পূর্ব ভারতে নারী (মনসা) হওয়ার কারণও চিন্তার বিষয়। পুরুষ সর্পদেবতা আর সর্পাধিষ্ঠাত্রী দেবী কল্পনার পশ্চাতে রহিয়াছে পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রভাব। তদ্রূপ মহীশূর কর্ণাটক আদি দেশে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ শক্তিশালী ছিল, সেইজন্য সেইস্থানে সর্পদেবতা স্ত্রীরূপিণী মুদাম্মা ও মঞ্চাম্মা, অন্ধ্রপ্রদেশে নাগাম্মা বা বাননাগাম্মা; উড়িষ্যায় বৈরাটপাট ঠাকুরাণী বা খেজিশ্বেরী এবং পুরাতন আসামের খাসিয়া পর্বতে উরূপ থ্লেন-এর পূজা হয়। ভারতের পূর্বাঞ্চলে সেই প্রকারে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের জন্যই হউক বা বৌদ্ধ মহাযানপন্থীদের হাওয়ায় হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের কারণেই হউক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক দুর্গা, কালী, মনসা আদি দেবী-শক্তির প্রাধান্য দেখা যায়।

বঙ্গ ও আসামে মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায় একসময় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাহাদের সর্পদেবী ছিল জাঙ্গুলী। জঙ্গল বা অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী অর্থে জাঙ্গুলী হইতে পারে। হিন্দুর মনসাদেবীর অপর নাম জাঙ্গুলী। প্রাগার্য্য মনসা-জাঙ্গুলীকে হয়তো কৌলীন্য দিয়া শিবের সহিত জড়িত করিয়া অভিজাত শ্রেণীতে তোলা হইয়াছে। মনসার ধ্যান মন্ত্রে আছে "বন্দে শঙ্কর পুত্রিকাং বিষহরীং পদ্মোদ্ভবাং জাগুলীম্। বিষহরী শব্দ প্রয়োগেও নামটির অর্বাচীনতার সাক্ষ্য বহন করে। সংস্কৃত বিষহর শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে বিষহরা হয় আর বিষহারী শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে বিষহারিণী হয়। বিষহরী শব্দ প্রয়োগ-সিদ্ধ হইয়াছে বলিতে পারি।

বিষহরী দেবীর জন্মকাহিনীও রহস্যজনক । ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আছে —

শ্রূয়তাং মনসাখ্যানং যৎ শ্রুতং ধর্মবক্তৃতঃ ।
কন্যা সা ভগবতী কশ্যপস্য চ মানসী ॥
তেনেয়ং মনসা দেবী মনসা যা চ দীব্যতি ।
মনসা ধ্যায়তে যা বা পরমাত্মানমীশ্বরী ॥
তেন সা মনসা দেবী যোগেন তেন দীব্যতি ।
আত্মারামা চ সা দেবী বৈষ্ণব সিদ্ধযোগিনী ॥[৩]

অর্থাৎ এই দেবী কশ্যপ মুনির মানসী কন্যা । তাই তাহার নাম মনসা । অথবা তিনি পরমাত্মাকে মনে মনে ধ্যান করার জন্য মনসা নাম পাইয়াছেন । এই দেবী আত্মারামা, বৈষ্ণবী ও সিদ্ধযোগিনী । মুকুন্দান্নী (মুকবি নারায়ণ দেবের অমধীয়া কাব্য মুকুন্দান্নী) মতে কিন্তু তিনি শিবের মানস কন্যা – "মনত জন্মিল কন্যা নামে মনসা ।"

এই দেবীর রূপ গুণের কথাও বর্ণিত হইয়াছে । তিনি গৌরবর্ণা, সুন্দরী ও মনোহরা । সেইজন্য তাহার অপর নাম জগদ্গৌরী, আবার শিবের শিষ্যা (কন্যা ?) শৈবী, অতীব বিষ্ণুভক্ত জন্য বৈষ্ণবী । জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে নাগগণের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম নাগেশ্বরী, বিষসংহারে সমর্থা হেতু বিষহরী আর মহাদেবের নিকট সিদ্ধযোগিনী । ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ মতে তাহার দ্বাদশ নাম রহিয়াছে । যেমন, জরৎকারু, জগদ্গৌরী, মনসা, সিদ্ধযোগিনী, বৈষ্ণবী, নাগভগিনী, শৈবী, নাগেশ্বরী, জরৎকারুপ্রিয়া, আস্তিকমাতা, বিষহরী এবং মহাজ্ঞানযুতা । কশ্যপের মন হইতে উদ্ভব হইয়াছিল জন্য নাম হয় মনসা । এই বিষয়ে একটি আখ্যান আছে –

প্রাচীনকালে মানুষের মনে সর্পভয় খুব বেশি হইয়াছিল । সর্পদংশন করিলেই মানুষের মৃত্যু হইত আর কখন কাহাকে দংশন করে তাহার নিশ্চয়তা নাই । ব্রহ্মা তখন কশ্যপ মুনিকে এই কথা জানাইলেন । কশ্যপ তখন নরকুল রক্ষার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন । তাঁহাকে দেখিয়া পিতামহ ব্রহ্মা কশ্যপকে তপস্যার দ্বারা বীজমন্ত্র সৃষ্টি করিতে উপদেশ দিলেন । কশ্যপ কেবল বীজমন্ত্র সৃষ্টি করিয়া ক্ষান্ত

হইলেন না, তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী একজন সৃষ্টি করিলেন, ইনি মনসা । তপোবলে কশ্যপমুনির মনোবলে তাঁহার সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া – মনসা ।

কুমারী কালে মনসা দেবী তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া মহাজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । মহাজ্ঞানের প্রভাবে মৃতকে পুনর্জীবন দান করা যায় । চান্দ সদাগরও মহাদেবের নিকট হইতে মহাজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । পরে পদ্মাবতী মহাদেবের আদেশে তিনযুগ ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের তপস্যা করেন । তপস্যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বরদান করেন, "অদ্যাবধি তুমি পৃথিবীতে দেবীরূপে পূজিতা হও ।" মহাদেবই তখন তাঁহাকে প্রথমে পূজা করেন ; তাহার পরে কশ্যপ ও দেবতা সকলে, তাহার পরে মনু, মুনি নাগগণ ও মানব সকলে তাহার উপাসনা করেন । এইভাবে স্বর্গ, মর্ত্য আর পাতালে তাঁহার পূজা প্রচারিত হয় ।

কন্যাকাল উপস্থিত হইলে মনসাকে পিতা কশ্যপ জরৎকারু নামে এক মহাতেজস্বী মুনির সঙ্গে বিবাহ দেন । একদিন জরৎকারু মুনি পুষ্কর তীর্থে একটি বটবৃক্ষতলে পত্নী মনসার উরুতে মাথা দিয়া নিদ্রামগ্ন ছিলেন । বেলা অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যা উপস্থিত হইল । মনসা উভয় সঙ্কটে পড়িলেন, সুখনিদ্রামগ্ন স্বামীকে জাগাইলে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে শাপ দিতে পারেন, অন্যদিকে সন্ধ্যা না করিয়া সন্ধ্যা পার হইলে ঋষির ব্রহ্মহত্যা পাপ লাগিবে । উপায়বিহীন হইয়া মনসা স্বামীকে নিদ্রা হইতে জাগাইলেন । সুকনান্নীর মতে মনসার বিবাহের সময়ে জরৎকারু মুনি শর্ত করিয়াছিলেন যে কোন কারণে কখনও মনসা কোন কার্যে বাধা দিতে পারিবেন না, আর বাধা দিলে তিনি মনসাকে ত্যাগ করিবেন ।

যাহা হউক জাগিয়া উঠিয়া মুনি তাঁহার সুখনিদ্রা ভঙ্গ করিবার জন্য পত্নী মনসাকে শাপ দিতে উদ্যত হইলেন । মনসা সকল কথা ব্যক্ত করিলেন । ঋষি মনসাকে ত্যাগ করিলেন, কারণ বিবাহের সময় প্রতিজ্ঞা ছিল যে মনসা কখনও তাঁহার কোন কার্যে তাঁহাকে বাধা দিতে পারিবেন না, আর তিনি সর্বতোপ্রকারে ঋষির অনুগতা হবেন ।

জরৎকারু মুনি মনসাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য বনে যাইতে উদ্যত হইলেন । পিতামহ ব্রহ্মা আসিয়া মুনিকে বলিলেন যে তিনি সংসারধর্ম পালনের জন্য

পুত্র জন্ম দেওয়ার পরে মনসাকে ত্যাগ করা বিধেয়। তখন জরৎকারু মুনি মন্ত্র জপ করিয়া মনসার নাভি স্পর্শ করিয়া বলিলেন — "প্রিয়ে আমার এই স্পর্শের দ্বারা তোমার গর্ভে একটি সন্তান জন্মিবে। সে পরম বৈষ্ণব, তপস্বী আর যশস্বী হইবে।" এই বলিয়া তিনি তপস্যা করিতে চলিয়া গেলেন।

মহাভারতে আস্তিক মুনির মাতা জরৎকারুর পত্নী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, মনসা নাম নাই। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে মনসার দ্বাদশ নামের ভিতরে জরৎকারু অন্যতম। মহাভারতের মতে বাসুকির জরৎকারু বলিয়া এক ভগ্নী ছিল। নাগরাজ বাসুকি জরৎকারু মুনির সহিত সেই একই নামের তাহার ভগ্নীর বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের পরে আস্তিকের জন্ম পর্যন্ত নাভিস্পর্শ করা সমস্ত ঘটনা দুই স্থানেই অর্থাৎ মহাভারত আর ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে একই প্রকার। এইভাবে মহাভারতের কাহিনীর সহিত পুরাণকাহিনী সংযুক্ত হইয়াছে। মহাভারতে কেবল ঋষি তপস্যায় যাওয়ার সময় বাসুকি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন — "বিবাহ হইল, কিন্তু সন্তান কোথায়?" ঋষি তখন পত্নী জরৎকারুর নাভিস্পর্শ করিয়া "অস্তি" বলিয়াছিলেন, আর তাহা হইতে আস্তিক মুনির জন্ম হয়। তাঁহার কালেই জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে নাগকুল রক্ষা পাইয়াছিল। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ মতে আষাঢ় মাসের সংক্রান্তিতে বা কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে স্নুহী শাখায় অর্থাৎ সিজ বৃক্ষের শাখায় এই দেবীকে পূজা করিতে হয়। এই-ভাবে আরাধনা করিলে ধনবান, পুত্রবান আর কীর্তিমান হইতে পারে।

ব্রহ্মান্নমাষাঢ় সংক্রান্ত্যং স্নুহী শাখাসু যত্নতঃ।
ধনবান্ পুত্রবাংশ্চৈব কীর্তিমাংশ্চ ভবেদ ধ্রুবম্ ॥

সুকনান্নীর মতে — "জন্ম মোর শ্রাবণ মাসে, কৃষ্ণপঞ্চমী দিনে, যে পূজো সেই তিথি লৈয়া। ধনে পুত্রে ঠাকুরান, সুখে থাকে চিরকাল, পূজা বিধি কহিলোঁ বুজায়া।" অসমীয়া মনসা কাব্যের আখ্যান মতে কিন্তু মনসাদেবীর পিতা স্বয়ং মহাদেব আর মাতৃগর্ভে স্থিতিলাভ না করিয়াও তিনি মহাদেবের ঔরসে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। সরোবরে পদ্মের মৃণাল বাহিয়া গিয়া তিনি পাতালে নাগ নাগিনীগণের রাণী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই তাঁহাকে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে জানা যায়। নিম্ন আসামে (আসামের দুই ভাগ উজনী|আপার আসাম এবং নামনী|লোয়ার আসাম) তিনি কেবল সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নহেন, মাছি, মড়ক আদির বিনাশিনী ও ঐশ্বর্যদাত্রী

দেবাও । মাড়ি মড়ক বিনাশিনী দেবীর পূজার অন্যনাম মারে পূজা । বড়ো-কছারী-গণের মধ্যেও এই পূজা প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে । মারে পূজায় মহিষ বলি ছাড়া একজোড়া মাগুর মাছ, একজোড়া ফড়িং একজোড়া মুরগী, বৎসরের মধ্যে উৎপন্ন ফলমূল, চিড়া-পিঠা, ভোগ, তামোল পান (পান সুপারী) দেওয়া হয় । প্রথম বৎসর পূজা দিবার পর পরের দুই বৎসর পূজা দিতে না পারিলে একটি শূকর নতুবা একটি কাল পাঁঠা অমাবস্যার রাত্রিতে দেবীর জন্য বলি দিয়া নৈবেদ্য দিতে হয় । এই পূজা করিলে ঐশ্বর্য বৃদ্ধি, যুদ্ধজয় হয়, পশুপালন করিলে হিংস্র জন্তু হইতে দেবী পশুগণকে রক্ষা করে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস ।[৪]

অথর্ব বেদে বীনাপাণি দেবীকে সর্পবিষ-বিনাশিনী দেবী বলা হইয়াছে । বীনাপাণির অপর এক নাম ব্রহ্মাণী । মনসারও অপর নাম ব্রহ্মাণী । মনকর, দুর্গাবরের পদ্মপুরাণে আছে — "তুষ্ট হুয়া ব্রহ্মাণী, মারিয়াক বোলে বাণী, ধন জন বাঢ়িব অপার ।" এই মারিয়াগণই আসামে সর্বপ্রথমে মনসাদেবীর পূজা করে । মনসা পূজার গোন্ধ বা অধিবাসের জাগরণ গীতে ওজাপালী সেইজন্য দেবদেবীর সহিত মারিয়া মারিয়ানীকেও জাগায় । পরে ইহার বিশদ আলোচনা হইয়াছে ।

বঙ্গীয় কবি জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল কাব্যে মনসাদেবীর জন্মরহস্য প্রথমে বর্ণিত হইয়াছে । তাহাতে আছে, যখন প্রলয় পয়োধিতে জগত নিমজ্জিত ছিল তখন অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বটপত্রে অনাদি ঈশ্বর নিরঞ্জন দেবতা শয়ন করিয়া ছিলেন । সেই সময়ে তাহার মনে পুনঃসৃষ্টির অভিলাষ জাগিয়া উঠে । তিনি চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তাঁহার ভ্রাতৃচতুষ্টয় চারিদিকে দেখা দিলেন । তিনি ভ্রাতৃগণকে সৃষ্টি করিবার আদেশ দিলেন । তখন চারিজন ভ্রাতা অনন্তসিন্ধুর মধ্যে ধর্মদেবতা নামে একজন দেবতা সৃষ্টি করিলেন । কিছুদিন বাদে রহস্যচ্ছলে চারিভ্রাতা একদিন প্রশ্ন করিলেন — "তোমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন ?" ধর্মদেবতা উত্তর করিলেন —"আমাকে আবার কে সৃষ্টি করিবে ? আমি অনাদি ও স্বয়ম্ভু, আমি নিজে নিজের পিতামাতা ।"

এই কথা শুনিয়া তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইলেন । ধর্মকে তদ্রূপ অহংকার ও অকৃতজ্ঞতার জন্য তাঁহারা শাপ দিলেন — "তুমি গলিয়া পচিয়া মরিবে, তোমাকে পাণ্ডুরঙের পোকায় খাইবে । তুমি জলে ভাসিয়া বেড়াইবে। আচ্ছা তুমি এখন সৃষ্টি

আরম্ভ কর ; ইহা তোমার প্রতি আমাদের আদেশ ।"

ধর্ম তখন স্বর্গ, মর্ত্য, দেবতা দানব আদি ভিন্ন ভিন্নভাবে সৃষ্টি করিলেন ; সঙ্গে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনজন দেবতাকে সৃষ্টি করিলেন । মানুষ সৃষ্টি করার পর মনে মনে ভাবিয়া তিনি আবার এক অতি সুন্দরী দেবীর সৃষ্টি করিলেন – নাম দিলেন মনসা । মনসার ভুবনমোহিনী রূপ দেখিয়া সৃষ্টিকর্তা ধর্ম নিজেই মুগ্ধ হইলেন আর মনসাকে তাঁহার পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন । পরে কিন্তু এইরূপ অন্যায় অযুক্তিসঙ্গত কার্য্যের জন্য তাঁহার অত্যন্ত পরিতাপ হইল আর লজ্জায় অধোবদন হইয়া তিনি পলাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন । পলায়ন অবস্থাতেই তিনি দেহত্যাগ করিলেন । মনসা-সতী ধর্মের চিতায় উঠিয়া সহমৃতা হইলেন ।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে সেই চিতাগ্নি হইতেই একটি শিশুকন্যার উদ্ভব হইল । ব্রহ্মার আদেশে তখন এই কন্যাকে মঞ্জুষ সাজাইয়া তাহার ভিতরে রাখিয়া সাগরে ভাসাইয়া দেওয়া হয় । সমুদ্রতীরে ধ্যানমগ্ন হেমন্ত মুনি অকস্মাৎ সেই মঞ্জুষ আর তার ভিতরে কন্যাকে দেখিয়া মঞ্জুষ হইতে কন্যাকে আনিয়া নিজ ভার্য্যার হাতে অর্পণ করেন ।

ঋষি হেমন্তের ঘরে সেই কন্যা চন্দ্রকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিলেন । ইতিমধ্যে মৃত ধর্মদেবতা কামনাপরবশ হইয়া নিজের সৃষ্ট শিব মহেশ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অর্ধেক ধর্ম আর অর্ধেক মহেশ্বর রূপে অবতীর্ণ হইলেন । মনকরের মনসা-কাব্যের এই অংশে অর্ধাঙ্গ মহাদেব অর্ধাঙ্গ ধর্ম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । মনসা পূজার প্রারম্ভে ধর্মদেবতার পূজা করার সময় 'ওতপালির' স্তুতিগীতে পাওয়া হয় –

তৃতীয় কলির শেষে এক ধর্ম উপজিলা
মোহেশ বুলি তার নাম থৈলা । ইত্যাদি –

যাহা হউক, মহেশ তখন মনসাপ্রাপ্তির দুর্বার বাসনায় একদিন নারদকে স্মরণ করিলেন । নারদ সমস্ত বুঝিতে পারিয়া "মনসা কামিনী" মনসা প্রাপ্তির উপায় দেখাইয়া শিবকে বিন্ধ্যপর্বতের নিম্নে একখানি উদ্যান (মানকুঞ্জ) নির্মাণ করিতে বলিলেন । সেই উদ্যানে হেমন্ত ঋষির কন্যা দুর্গা আর শিবের মিলন হয় । মনসাই

দুর্গা। দুর্গা-শিবের মধুর মিলন বর্ণনা অসমীয়া মনসা কাব্যেও রহিয়াছে।

অসমীয়া মনসা কাব্যের মনসা কিন্তু ধর্মের কন্যা বা ধর্মের ভার্য্যা নহেন, দুর্গাও নহেন তিনি সরাসরি কশ্যপমুনির কন্যাও নহেন। অসমীয়া কাব্য-মতে মনসাদেবী শিববীর্য্য সম্ভূতা, শিবদুহিতা, শিবের ন্যায় ত্রিনয়ন বিশিষ্টা, ত্রিনয়নী। মনসার ভুবনমোহিনী রূপে মুগ্ধ মহাদেব একদিন মনসাকে কামভাবে আলিঙ্গন করিতে চাহিয়াছিলেন আর তার ফলে নিজ পরিচয় দিতে বাধ্য হইয়া তৃতীয় (বিষ) নয়ন দ্বারা দৃষ্টিপাত করিয়া মহাদেবকে অচেতন করিয়া দিয়াছেন। সুকনান্নীর এই কাহিনীকে গোসাঁই দংক বলে। পরবর্তী অংশে ইহা বিশদভাবে আলোচনা করা হইবে।

মনসা কাব্যের মনসা দেবী হইয়াও রূপগুণ, বুদ্ধিকৌশল, ঈর্ষা-প্রতিশোধ পরায়ণতা আদি মানবীয়গুণে বিভূষিতা এক নারী হইয়া উঠিয়াছেন। অথর্ব বেদের সর্প বিষ বিনাশিনী বীনাপাণি ব্রহ্মাণী শিয়া পুরাণের কশ্যপদুহিতা মনসা হইলেন, এনা ভক্তজন পূজিতা শিবকন্যা মনসা দেবী অন্য স্বতন্ত্র দেবী, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার সম্ভব নহে। আসলে একই দেবী ভিন্ন সময়ে ভিন্নভাবে কল্পিতা হইয়াছিল যেন অনুমান হয়। অসমীয়া মনসা কাব্যের মনসা দেবী কিন্তু ভক্তবৃন্দ পূজিতা দেবী হইয়াও নাটকে পূর্ণাঙ্গ শ্রেষ্ঠ নায়িকার ন্যায় কার্য করিয়াছেন। সময়মত তিনি মানবীয় দুর্বলতার বশবর্তী হইয়া ক্রন্দন করিয়াছেন (নেতার গলে ধরি, কান্দে মাও বিষহরী — ওহে বিবাদ করিলোঁ অকারণ), সময়ে সময়ে আবার দেবী সুলভ কৌশলে ধন্বন্তরী বধের অদ্ভুত পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, আবার কখনও তিনি ধরায় ভ্রমণ করিয়া কূটবুদ্ধির খেলা খেলিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী চন্দ্রধরের সর্বনাশ চিন্তা করিয়াছেন, — পরমুহূর্তে হয়তো কৈলাশ শিখরে বিহার করিয়াছেন। ইনি মনসাপূজার দেবী বিষহরী। "কলৌ কৃষ্ণঃ, কলৌ কালী, কলৌ জাগ্রত মনসা।"

মনসামঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে মানবীয় রসের প্রাধান্য থাকায় ইহা খুব জনপ্রিয় হইয়াছে। ব্রতকথা, গীতিকাব্য ও মহাকাব্য এই তিন মিলিয়া ইহার কাহিনী গঠিত হইয়াছে। সেইজন্য মনসামঙ্গল কাব্য অন্য কাব্য হইতে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে। চান্দ সদাগরের কাহিনীর স্থান নদনদী, গ্রাম জনপদের নাম বিহার হইতে আরম্ভ

করিয়া বঙ্গদেশ ও আসামে এমনভাবে ছড়াইয়া আছে যে, ইহার ঐতিহাসিক যথার্থ পরিচয় খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে মনসা কাহিনীর উৎপত্তি পশ্চিমবঙ্গ বা বিহার হওয়াই স্বাভাবিক।[৫] চান্দ সদাগরের বাণিজ্যপথের বর্ণনায় পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চল বিশেষের প্রভাব দেখা যায়। বিহারে বেহুলার ব্রতকথা, গল্প কাহিনী ও মনসাপূজার প্রচলন আছে।[৬] কেহ কেহ মনে করেন যে মনসামঙ্গলের চম্পকনগর বোধহয় ভাগলপুরের নিকটবর্তী অঞ্চল। কিন্তু তখনকার কবিরা লোকমুখে যেসব গ্রাম জনপদের নাম শুনিতেন তাহাকেই কল্পনার দ্বারা রঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিতেন। তাই মনসামঙ্গলের কাহিনীর পশ্চাতে এখন যেসব স্থানাদির কথা উল্লেখ হইয়াছে, তাহার যথার্থ ইতিহাস বা ঘটনার সন্ধান পাওয়া সুকঠিন — প্রায় অসম্ভব।

বিহার, বঙ্গ ও আসামের নানা স্থানে মনসামঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়াছে। এই মনসামঙ্গল কাব্যগুলির কাহিনীমধ্যে প্রত্যেক কবির কাব্যের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। তাই প্রত্যেক অঞ্চলের কাব্য-কাহিনীর স্বতন্ত্র আলোচনা করা প্রয়োজন। আলোচনার সুবিধার্থে মনসামঙ্গল কাব্যগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হইল। যথা—

(১) বঙ্গের মনসামঙ্গল — বিষ্ণুপাল, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, সীতারাম দাস, রসিক মিশ্র, বাণেশ্বর রায়, হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণদেব, বংশীদাস, বিপ্রদাস, তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল ও জীবন মৈত্র।

(২) কামতা কামরূপের মনসামঙ্গল — মনকর, দুর্গাবর ও নারায়ণদেব।

(৩) বিহারী মনসামঙ্গল — বিহারে কোন কোন অঞ্চলে ব্রত ছড়ার আকারে এই কাহিনী প্রচলিত আছে, কিন্তু কোন কবির নাম পাওয়া যায় না।

(১) বঙ্গের মনসামঙ্গলের কাহিনীর বৈশিষ্ট্য ।

উভয় বঙ্গের (পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের) কবির রচিত মনসামঙ্গলের কাহিনীতে নানা বৈচিত্র ও পার্থক্য সত্ত্বেও ঘটনা আদর্শ ও চরিত্রের দিক দিয়া মোটামুটি সাদৃশ্য আছে । অনেক সময় একই কবির বিভিন্ন পুঁথির মধ্যে অনেক পাঠবৈষম্য এবং একাধিক ভণিতা পাওয়া যায় । ইহা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য । অর্ধশিক্ষিত গায়েনগণ অনেক সময় ভাষা, ঘটনা ও পালা বদল করিয়া দিত । তবু মনসামঙ্গলের নানা পুঁথির মধ্যে কাহিনীগত ঐক্য লক্ষ্য করা যাইবে ।

মনসামঙ্গলের চান্দের বিদ্রোহ ও বেহুলার সতীত্ব কাহিনী বাঙ্গলা দেশে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে এবং কাব্যের এই দুইটি অংশই অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে । কাহিনীর প্রথম অংশ দেবখন্ড । এই খন্ডে মনসার জন্ম হইতে মর্তলোকে পূজা প্রচারের জন্য অবতরণ পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে । এই অংশের আখ্যান কিয়দংশে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত কিছুটা বা পুরাণ ও মহাকাব্যের গল্পের দ্বারা প্রভাবিত । কাহিনীর সূচীপত্র তৈয়ার করিলে এই হইবে ।

মহাদেবের মানসকন্যা মনসার জন্ম, মহাদেব কর্তৃক তাহাকে লুকাইয়া রাখা, চন্ডীর ক্রোধ, মনসা ও চন্ডীর কলহ, চন্ডী কর্তৃক মনসার একচক্ষু কাণা, মনসার কোপ দৃষ্টিতে চন্ডীর মূর্ছা, পরে মনসার দ্বারা চেতনালাভ, গৌরীর প্রতিকূলতায় কৈলাশ ত্যাগ করিয়া পদ্মাবতীর (মনসা) জয়ন্তী নগরীতে পুরী নির্মাণ । এই পর্যন্ত হর-দুর্গা-মনসার কৈলাশের কাহিনী । দেবীলীলা এইখানে সমাপ্ত । তাহার পরে মনসার পূজা গ্রহণের চেষ্টা ।

প্রথমে রাখাল, তারপরে হাসান হুসেনের বিরোধিতা ও বিরোধিতা হ্রাস, চান্দ সদাগরের উদ্যান নষ্ট, ধন্বন্তরী বধ, চান্দের বিরোধিতার ফলে তাহার ছয়পুত্রের প্রাণ বিনাশ, চান্দের বাণিজ্য যাত্রা, চৌদ্দডিঙ্গা নিমজ্জন, লখীন্দরের জন্ম চান্দের দেশে প্রত্যাবর্তন, লখীন্দর-বেহুলার বিবাহ, লৌহবাসরে কালনাগের দংশনে লখীন্দরের মৃত্যু, কলার ভেলায় লখীন্দরের মৃতদেহের সঙ্গে বেহুলার স্বামীকে জিয়াইবার জন্য যাত্রা । এই পর্যন্ত কাহিনীর দ্বিতীয় অংশ ।

তৃতীয় অংশ বেহুলার নানা প্রলোভন, দুঃখ কষ্ট তুচ্ছ করিয়া স্বর্গে উপস্থিতি, নৃত্যগীতে মহাদেবের প্রীতি এবং মহাদেব ও দেবতাদের অনুরোধে মনসার লখীন্দরকে বাঁচাইয়া দেওয়া, বেহুলার ছয় ভাসুরের জীবনলাভ, চান্দের নিমজ্জিত নৌকা লাভের আশা। চান্দ মনসার পূজা করিবেন — এই প্রতিজ্ঞার পর তবে মনসা অনুকূল হইলেন।

চতুর্থ অংশ উপসংহার। বেহুলা লখীন্দরের ডোমের ছদ্মবেশে পিতৃরাজ্যে প্রত্যাবর্তন, পরে মিলন। চান্দ প্রথমে কিছুতেই মনসা পূজা করিতে চাহেন নাই। কিন্তু সোমাই পণ্ডিত, সনকা, বেহুলা ও অন্যান্য বন্ধু বান্ধবদের অনুরোধে বামহস্তে মনসাকে পুষ্প দিয়া (সমস্ত মনসামঙ্গলে বাম হস্তের কথা নাই) পূজা করিলেন। মনসার পূজা প্রচারিত হইল, মঠমন্দির নির্মিত হইল। বেহুলা লখীন্দর স্বর্গের উষা অনিরুদ্ধ, মর্ত্যলোকে দেবীর পূজা প্রচারের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবীর অভীষ্ট সিদ্ধির পর তাঁহারা সশরীরে স্বর্গে গেলেন। সমস্ত মনসামঙ্গলে কাহিনীটি প্রায় এইভাবে বিবৃত হইয়াছে। যদিও বহুস্থানে নূতন পালা, বর্ণনা, ঘটনা ও চরিত্র সংযোজিত হইয়াছে।

(২) কামতা-কামরূপের মনসামঙ্গল কাহিনীর বৈশিষ্ট্য।

আসামের মনসামঙ্গলের কাহিনীর আলোচনা কালে আমরা তিনজন কবির রচিত কাব্য অনুসরণ করিব। এই তিনজন কবির রচনার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে। কবিত্রয় হইলেন মনকর, দুর্গাবর কায়স্থ এবং নারায়ণদেব।

দুইটি খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ পুঁথিকে একত্র করিয়া মনকর এবং দুর্গাবরের মনসাকাব্য সম্পাদিত হইয়াছে।[৭] দুইজন কবি যেন অংশ ভাগ করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। প্রথমার্ধ কবি মনকরের রচনা আর দ্বিতীয়ার্ধ দুর্গাবরের রচনা। অথচ দুইজন কবিই দুই ভিন্ন শতকে তাঁহাদের কাব্য রচনা করেন।

এতদ্ব্যতীত সুকবি নারায়ণদেবের কাব্য সম্পাদনা করা হইয়াছে।[৮] সুকনান্নী পদ্মাবতী নামে ইহা জনসমাজে সমাদৃত। আদ্যন্ত নারায়ণ দেবের রচনা বলিয়া সম্পাদক স্বীকার করিলেও, বহু জনপদের কবির রচিত পদ এই পুস্তকে

সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অসংখ্য শব্দের সন্নিবেশে গ্রন্থ বিরাট কলেবর ধারণ করিয়াছে।

মনকরের রচনা তিনটি খণ্ডে সীমাবদ্ধ, (১) সৃষ্টি খণ্ড, (২) শিব দুর্গার প্রণয় (৩) এবং মনসার জন্ম ও বিবাহ। কাহিনী এই তিন খণ্ডে পরিণতি লাভ করিয়াছে। প্রথমে আদ্য গোঁসাই দুইটি পক্ষী সৃষ্টি করেন। কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইবার পর পক্ষিণী পক্ষীকে বিবাহের প্রস্তাব করে। কিন্তু পক্ষী তাহা অস্বীকার করে। কারণ ভ্রাতা এবং ভগ্নীর মধ্যে বিবাহ সম্ভব নহে। তাহার পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। একদিন পক্ষী যৌনভাবে উত্তেজিত হইলে তাহার বীর্য নিঃসৃত হইয়া নদীজলে পতিত হইল। সেই বীর্য অজ্ঞাতসারে পক্ষিণী গ্রহণ করিয়া গর্ভবতী হয়। পরে অবশ্য তাহারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। যথা সময়ে পক্ষিণী তিনটি ডিম্ব প্রসব করে। তাহা হইতে তিনটি জীবন্ত প্রাণীর সৃষ্টি হয়।

কাব্যের পরবর্তী অংশে দেখা যায়, স্রষ্টা (ধর্ম) ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। যখন শক্তিপরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁহারা তিনজন নদীতীরে ধ্যান নিমগ্ন তখন ধর্ম মৃতদেহের ছদ্মবেশে স্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া তাহাদের নিকটে আসিলেন। সেই মৃতদেহ ব্রহ্মার নিকটে আসিলে ব্রহ্মা পদাঘাতে তাহা দূরে অপসারিত করেন। বিষ্ণুও তাহাই করিলেন, কারণ তাহার সাধনার ব্যাঘাত হইয়াছিল। তৎপর মৃতদেহ শিবের নিকটে আসিলে শিব নিজ পিতার মৃতদেহ চিনিতে পারিয়া তীরে তুলিয়া মুখ দিয়া তাহার উদর হইতে সমস্ত জল বাহির করিয়া ফেলিলেন। ধর্ম প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন। ধর্ম তখন শিবের দেহের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিলেন। শিব মুখ ব্যাদান করিলে ধর্ম নিজেকে শিবের মধ্যে প্রবেশ করাইলেন। তাহার পরবর্তী অংশে কাব্যে রহিয়াছে শিব গঙ্গাকে বিবাহ করিলেন এবং দুর্গাকে লৌহবাক্সে ভরিয়া জলে ভাসাইয়া দিলেন। কিন্তু সেই লৌহ বাক্স জলে না ডুবিয়া ভাসিয়া রহিল।[১] সেই নদীতীরে হেমন্ত ঋষি ধ্যান মগ্ন ছিলেন। লৌহবাক্স তাহার নিকটে আসিল। হেমন্ত ঋষি বাক্স হইতে দুর্গাকে উদ্ধার করিয়া নিজ কন্যারূপে পালন করিতে লাগিলেন। দুর্গা হেমন্ত-কন্যা রূপে বড় হইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড হইল শিবের সহিত দুর্গার প্রণয় এবং পরিণয়। শিব গঙ্গাকে লইয়া সংসার করিতে লাগিলেন। তিনি বিশ্বকর্মার সাহায্যে একটি কানন নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল দুর্গার প্রতি প্রেম নিবেদন করা। দুর্গা সেই কাননে ফুল তুলিতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। একদিন নানা সাজে সুসজ্জিতা দুর্গা শিবের সেই কাননে প্রবেশ করিলেন। শিব খবর পাইলেন তাঁহার ইপ্সিত দ্বিতীয় পত্নী দুর্গা কাননে আসিয়াছেন। শিব কানন মধ্যে আসিয়া দুর্গাকে তাহার প্রণয় নিবেদন করিলেন। পরস্পর প্রণয়াশক্তিতে তাহারা দুইদিন তথায় অতিবাহিত করিলেন। দুর্গা কি প্রকারে তাহার পিতার নিকট ফিরিবেন তাহার জন্য দুশ্চিন্তা করিতে লাগিলেন। দুর্গা মহাদেবকে শুধিলেন —

কি বুধি করিম গোঁসাই রে
কেমনে যাইবো ঘর ;
কি কথা কহিবো যাইরে
আতাইরে বরাবর ॥

অপর দিকে মহাদেবের এই গোপন প্রেমের কথা নারদ গঙ্গাকে জানাইলেন। গঙ্গা এই কথা শুনিবা মাত্র তাহার দুই পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন। দুর্গা নদী পার হইবার সময় তাঁহাকে ডুবিয়া মারিবার জন্য দুইজনে যুক্তি করিলেন। কিন্তু দুর্গা কৌশলে নদী পার হইয়া নিরাপদে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। দুর্গা দুইদিন পর গৃহে ফিরিয়া আসার জন্য হেমন্ত ঋষি কন্যার প্রতি সন্দিহান হইয়া তাহার পরীক্ষা গ্রহণ করিতে চাহিলেন। দুর্গা কৌশলে অষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইলেন।

যথাসময়ে শিব দুর্গাকে বিবাহ করিবার বাসনা গঙ্গাকে জানাইলেন। গঙ্গা প্রথমে দরিদ্র এবং বৃদ্ধ বলিয়া শিবকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পরে সেই আপত্তি টিকিল না। নারদ বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতে লাগিলেন। .... গঙ্গা এবং দুর্গা দুই স্ত্রী লইয়া বাস করিতে লাগিলেন শিব।

শেষ সর্গে মনসার জন্মকাহিনী ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রাচীন বাংলা মঙ্গলকাব্যের ন্যায় দুর্গা শিবকে সন্দেহ করিতে লাগিলেন। একদা শিব তাঁহার ফুলের করণ্ডী চান্ ছাদের মধ্যে রাখিয়া প্রাত্যহিক নিয়ম মত ধ্যানে বসিলেন। দুর্গা অভ্যাসবশতঃ সেই ফুলের করণ্ডী নামাইয়া আনিতে চেষ্টা করেন। মনসা তাহার

112944 MAY
NORTH BENGAL
University Library
Raja Rammohunpur

ভিতরে মাছিরূপে চুপ করিয়া থাকেন । ..... কেবল কবি তাঁহার কাব্যের শেষ অংশে লিখিয়াছেন পদ্মা লখাইকে বাসরঘরে প্রবেশ কালে দংশন করেন ।[১০]

পরবর্তী অংশ কবি দুর্গাবর কায়স্থের রচনা । গঙ্গাতীরের চম্পাবলী নগরের বর্ণনা দিয়া দুর্গাবরের কাব্য আরম্ভ হইয়াছে । সেই চম্পাবলী নগরের ব্যবসায়ী চান্দ সদাগর তাঁহার স্ত্রী সনকাকে লইয়া বাস করিতেন । চান্দ প্রচণ্ড শিবভক্ত ছিলেন, অন্য দেবদেবীর প্রতি তাঁহার মোটেই আস্থা ছিল না ।[১১] অন্যদিকে ধনী হইলেও চান্দ ও সনকা সুখী ছিলেন না কারণ সন্তানাদি না থাকায় লোকে তাঁহাদের অত্যন্ত অবহেলা করিত ।

এক বর্ষার দিনে ধন্বন্তরী নামে এক ওঝা আসিয়া গৃহের বহিঃপ্রাঙ্গণে অনেক বাজাইতে লাগিলেন । সনকা আসিয়া সেই ওঝাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সে কোন দেবতা ভক্ত এবং তাহার পূজা করিলে কি ফল লাভ হয় ? তখন ওঝা বলিলেন যে তাঁহার ইষ্টদেবীর অদ্ভুত শক্তি যাহা ব্যাখ্যা করিয়া শেষ করা যায় না । কেবল বলা যায় যে সেই দেবীর পূজা করিলে অপুত্রের পুত্র হয়, নির্ধনের ধন আর বন্দী মুক্তিপ্রাপ্ত হয় । তবে গৃহে একটি ঘট বসাইয়া তাঁহাকে পূজিতে হইবে । প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিয়া তাঁহার পূজা করাই উচিত । যদি পূজাকালে বলা যায় "মনসাই মাই" তাহা হইলে মনস্কামনা পূর্ণ হয় ।[১২] সনকা ওঝার কথায় সন্তুষ্টা হইয়া তাহার নির্দেশ অনুসারে প্রতিদিন গঙ্গায় ডুব দিয়া বলিতেন "মনসাই মাই" । একদিন গঙ্গা আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপনীতা হইয়া সনকাকে ছয়টি ফুল দিয়া তাহা ভক্ষণ করিতে বলিলেন । তিনি বলিলেন যে ইহা করিলে সনকা নিশ্চয় পুত্রবতী হইতে পারিবেন । বরলাভে সনকা আশান্বিতা হইলেন, যথাসময়ে চান্দ-সনকার ছয়টি পুত্রলাভ হইল । পুত্রগণ বড় হইলে তাহাদের বিবাহ দেওয়া হইল । পুত্র-বিবাহে চান্দ কোষাগার হইতে অনেক অর্থ ব্যয় করিলেন । অতঃপর রাজকোষ পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে চান্দ সিংহলে বাণিজ্যযাত্রার আয়োজন করিলেন ।

সমুদ্রযাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী সনকা নৌকা-পূজার ব্যবস্থা করিলেন । পূজার আয়োজন করিবার সময় সনকা পার্শ্ববর্তী জালুয়ার গৃহে মাগুর মাছ ক্রয় করিতে গেলেন । সেখানে দেখিলেন জালুয়া বধূ

তাহার পুত্রবধূ সহ মনসার পবিত্র ঘটে পূজা করিতেছে । সনকা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন সারদই শিবকন্যা মনসার পূজা করিতেছে । সারদই বলিল যে মনসার পূজা করিলে সর্বসম্পদ লাভ হয় ।[১০] সনকা এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়া মৎস্য লইয়া গৃহে ফিরিয়া যথারীতি নৌকা পূজা ব্রত সমাপন করিলেন । যথাসময়ে চান্দ যাত্রা আরম্ভ করিলেন ।

চান্দের অনুপস্থিতিতে তাহার ছয় পুত্রকে মনসার কোপে একে একে সর্প দংশন করিল । ওঝা ধন্বন্তরীকে ডাকা হইলে মনসা তাহাকে আসিতে বারণ করিলেন । ধন্বন্তরী মনসার নিষেধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না । চান্দের ছয় পুত্রের মৃত্যু হইল । মৃতদেহগুলি নেতা সযত্নে এক স্থানে রক্ষা করিলেন । চান্দ গৃহে প্রত্যাবর্তন কালে মনসা যাত্রীসমেত চান্দের চৌদ্দ ডিঙ্গা সমুদ্র জলে নিমজ্জিত করিলেন । অবশ্য গঙ্গা এই কার্যে মনসাকে সাহায্য করিয়াছিলেন । এই কাহিনীর সহিত বঙ্গীয় কাহিনীর সাদৃশ্য আছে ।

গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর চান্দ তাহার অশেষ লাঞ্ছনার কথা সনকাকে বলিলে প্রত্যুত্তরে সনকা বলিলেন যে চান্দ লাঠি মারিয়া মনসার ঘট ভাঙিয়া ফেলিবার জন্যই ইহা হইয়াছে । মনসা বিধবা ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশে চান্দ এবং সনকার সম্মুখীন হইয়া বিবাদ বন্ধ করিতে উপদেশ দিলেন । তাহার আসল উদ্দেশ্য ছিল অনিরুদ্ধের আত্মা আনিয়া সনকার গর্ভ সঞ্চার করা । চান্দ এবং সনকাকে শান্ত করিয়া ব্রাহ্মণী অন্তর্হিতা হইলেন । দশমাস পরে সনকা এক পুত্র সন্তান প্রসব করিল । চান্দ পুত্রের নাম দিলেন লখিন্দর । এক হস্তরেখাবিদ্ লখিন্দরের হাত দেখিয়া ঘোষণা করে যে এই শিশু বড় হইলে পুণ্যবান হইবে কিন্তু বিবাহের রাত্রিতে তাহাকে সর্প দংশন করিবে । যাহা হউক লখিন্দর ষোড়শ বৎসর প্রাপ্ত হইলে বেহুলার সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হইল । মনসার স্বামী অজগর স্ত্রীর অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া লখিন্দরকে দংশন করিল । বাংলা কাব্যে দেখা যায় কালীনাগ লখিন্দরকে দংশন করিয়াছিল । বেহুলা অজগরকে বন্দী করিয়া রাখিল । ধন্বন্তরী লখিন্দরকে বাঁচাইতে আসিতেছিলেন কিন্তু পথিমধ্যে মনসা বিষধর সর্পের রূপে তাঁহাকে দংশন করিলেন । ধন্বন্তরীর চারিজন শিষ্য ঔষধ আনিতে গিয়াছিল কিন্তু সর্পদংশনে চারিজন

ওঝাই প্রাণ হারাইল । ধন্বন্তরীর মৃত্যু হইল । লখিন্দরকেও মৃত্যুবরণ করিতে হইল । অতঃপর বেহুলা সর্প, ময়ূর এবং রাজহংস সঙ্গে লইয়া স্বামীর পুনর্জীবনের জন্য কলার ভেলায় জলে ভাসিল । তাহার পরের কাহিনীর সহিত বাংলা কাহিনীর সাদৃশ্য আছে । নেতার সাহায্য লইয়া বেহুলা স্বর্গে পৌছিল । তথায় দেবতাগণের সম্মুখে নৃত্য প্রদর্শন করিয়া মনসার কৃপা যাচ্ঞা করিল । মনসার কৃপায় বেহুলা লখিন্দর এবং অপর ছয়ভাই, যাত্রী এবং চৌদ্দ ডিঙ্গা সবই ফেরৎ পাইল । অতঃপর চম্পাবনী প্রত্যাবর্তনের বর্ণনা । ফিরিবার সময় অবশ্য এক রাজস্ব আদায়কারীর সহিত বেহুলার দ্বন্দ্ব হইয়াছিল ।[১৪] শিশু এবং আত্মীয় স্বজনের জীবন সেই রাজস্ব আদায়কারী ফেরৎ পাইয়াছিলেন (বোধ হয় মনসার কৃপায় । উপজীবন যেমন বলিয়াছেন) । রাজা তাহার স্ত্রীসহ মনসার পূজা করিয়াছিল ।[১৫]

মনকা রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছিল তাহার পুত্রগণ ফিরিয়া আসিয়াছে । বেহুলা প্রথমে ডোমনীর বেশে মনকার সম্মুখে উপস্থিত হইল কিন্তু অল্প পরে মনকার পুত্রবধূরূপে নিজ পরিচয় দান করিল ।[১৬]

সকলে চম্পাবনী নগরে প্রবেশ করিল । মনকা সকলকে বরণ করিবার জন্য বাহিরে আসিল । মূল পুঁথি ছিন্ন প্রায় আর অনেক স্থানে বাদ পড়িয়াছে ; তাহার ফলে কাহিনীর আসল অংশ চান্দ কিরূপে মনসার নিকট আত্মসমর্পণ করে সেই অংশটিই খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই । আর চান্দ কিভাবে মনসার পূজা করে তাহাও অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে ।

নারায়ণদেবের রচিত অসমীয়া পদ্মাপুরাণ, সুকনান্নী সম্পাদিত হইয়াছে । ইহাতে প্রাচীন অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যের একটি দিক আমাদের সম্মুখে উন্মোচিত হইয়াছে । অসমীয়া ভাষায় এইরূপ সুবৃহৎ কাব্য সম্পাদনা খুব বেশি হয় নাই ।[১৭]

কাব্যখানিকে দুইটি খণ্ডে বিভক্ত করা যায়, দেবখণ্ড ও মানবখণ্ড । কাব্যখানির সহিত বঙ্গদেশের সুকবি নারায়ণদেবের কাব্যের সহিত সাদৃশ্য দেখা যায় । দেব খণ্ডে দেবতার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে । প্রথমে দেখা যায় অন্যান্য মুনিগণের নিকট লোমশ মুনি প্রজাপতির সৃষ্টি বর্ণনা করিয়াছেন । ভগবান প্রজাপতি জলমগ্ন

সমুদ্রে অনন্ত শয্যায় শায়িত ছিলেন । তাহা হইতে ব্রহ্মার সৃষ্টি হয় । তারপর মধুকৈটভের জন্ম, চৌদ্দভুবন সৃষ্টি ইত্যাদির বর্ণনা আছে । অনন্ত-গরুড় এর জন্ম, গজকচ্ছপের যুদ্ধ, বিনতার দাসীত্ব, সমুদ্রমন্থনের কাহিনী ইত্যাদি কোন পুরাণ কাহিনীই বাদ পড়ে নাই । বাংলা বংশীদাসের কাব্যের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে ।

নেতা ও মনসার জন্মকাহিনীর সহিত অন্যান্য অসমীয়া কাব্যের সাদৃশ্য রহিয়াছে এবং দ্বিজবংশীদাসের কাব্যের সহিতও বৈসাদৃশ্য দেখা যায় না । মহাদেবের ঘর্ম হইলে বস্ত্রদ্বারা তাহা মুছিয়া বস্ত্র নিক্ষেপিত করিলে নেতার জন্ম হয় । আর স্নান কালে পুষ্পবনমধ্যে বিল্ববৃক্ষে জোড়া বিল্বফল দেখিয়া শিবের বীর্য স্খলিত হয় । শিব তাহা হাতে লইয়া পদ্মপত্রে রাখিলে পদ্মের মৃণাল বাহিয়া সেই বীর্য পাতালে যায়, সেথায় বিষহরীর জন্ম হয় । তিনি কশ্যপের মনে সৃষ্টা, বাসুকির ভগিনী । কদ্রুর পালিতা কন্যা পদ্মা শিবের সহিত পরিচয় কালে নিজের শক্তির পরিচয় দেন । পদ্মার শিবের সহিত কৈলাস যাইবার পথে হালুয়া বড়াই-এর নিকট প্রথম পূজা গ্রহণ, কৈলাসে আসিয়া চণ্ডীর সহিত দ্বন্দ্ব সর্বোপরি জরৎকারু মুনির সহিত বিবাহ, কিয়ৎকাল পরে জরৎকারু মুনি কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া কাননে দিনযাপন, আস্তিকের জন্ম, সমস্ত ঘটনার সহিত বঙ্গীয় কবি নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ বা বংশীদাসের পদ্মাপুরাণের সহিত সাদৃশ্য দেখা যায় । আস্তিকের জন্মের পর পদ্মার আর দিন চলে না ; তাই পদ্মাকে শিশু ক্রোড়ে লইয়া পূজা পাইবার জন্য মর্ত্যে আসিতে হইল । এইখানে দেব কাহিনীর সমাপ্তি বলা যায় ।

মানব কাহিনীতে দেখা যায় পশুসখা নামে মুনির সর্বৈরী রূপে পুনর্জন্ম হইলে চান্দ সদাগর নাম হয় । চান্দ সদাগরের সনকার সহিত বিবাহ, মনসার সহিত বিবাদ, অপরদিকে ভগ্নী নেতার সহিত যুক্তি করিয়া চান্দের সহিত বিবাদে তাহাকে পরাস্ত করা সমস্তই যেন বঙ্গীয় কাহিনীর ন্যায় গতি লাভ করিয়াছে ।

ইহার পর স্বর্গের ঊষা-অনিরুদ্ধের ইন্দ্রের অভিশাপে ঊষা বেহুলারূপে এবং অনিরুদ্ধ লখিন্দর রূপে জন্ম হইতে তাহাদের বিবাহ, মনসার দুষ্কার্য্য সাধনের জন্য লখিন্দরকে বিবাহ রাত্রিতে সর্প দংশন বেহুলার ভেলায় স্বর্গগমন হইতে লখিন্দরকে পুনর্জীবিত করিয়া চম্পকনগরে প্রত্যাবর্তন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্গারোহণ পর্যন্ত কাহিনী বঙ্গীয় কাহিনীর ন্যায়। তবে এই কাব্যে ধর্মদেবতার কথা এবং শিবের সহিত দুর্গার প্রেমের কথা লেখা নাই। তাহা ছাড়া কাহিনীর সম্পূর্ণ অংশ অন্য কাহিনীর সহিত সাদৃশ যুক্ত।

ষোড়শ শতকের অসমীয়া কবিগণের সহিত সপ্তদশ শতকের বঙ্গীয় কবি জগজ্জীবনের রচনার মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে। কেবল মনকর আর দুর্গাবরের পুঁথি ছিন্নপ্রায় হওয়ায় সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য ঠিক খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। নিম্নলিখিত স্থানে বঙ্গীয় এবং অসমীয়া কাহিনীর মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

১) আদ্য গোঁসাই-এর একজোড়া পক্ষীর সৃষ্টি এবং তাহাদের প্রসবিত তিনটি ডিম হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের সৃষ্টি মনকরের বাহিরে অন্য কোন কবির কাব্যে দেখা যায় না।

২) মনকরের কাব্যের ধর্মের মৃত্যুর পর গঙ্গা ও দুর্গাকে শিবের নিকট সমর্পণ-ও অনবদ্য।

৩) ধন্বন্তরী কর্তৃক মর্ত্যে মনসাপূজার প্রসার দুর্গাবর কায়স্থের বাহিরে অন্য কোন কবির কাব্যে পাওয়া যায় না। ইহাতে দেবীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কতখানি প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ আছে। মনকর এবং দুর্গাবরের কাহিনীতে গঙ্গার আবির্ভাব এক অদ্ভুত ঘটনা।

৪) বিপ্রদাসের কাব্যের মত অসমীয়া মনসাকাব্যে দেখা যায় যে, চান্দের পরিবারে জেলে গৃহে মনসা পূজা দেখিয়া আসিয়া নিজেদের গৃহে পূজার ব্যবস্থা করে।

৫) কেবল 'সুকনান্নী পদ্মাবতী' কাব্য ব্যতীত অন্য কোন অসমীয়া কাহিনীতে পৌরাণিক কাহিনীর সমাবেশ দেখা যায় না।

পরিশেষে ইহাই বলিতে পারা যায় যে অসমীয়া মনসা কাহিনীতে কেবল ঘটনার বিবর্তন দেখা যায় কিন্তু মনসার সর্পদেবী হিসাবে বিশেষ কোন পরিচয় নাই, দেবীকে কেবল অন্য উদ্দেশ্য লইয়াই পূজা করা হইয়াছে ।

ঘ) বঙ্গদেশে মনসামঙ্গল রচনার ইতিহাস ও কবি গোষ্ঠী

মনসামঙ্গল কাব্য বিহার, বঙ্গ ও আসামের কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত। এই বঙ্গদেশে মনসামঙ্গল সাধারণত: পদ্মপুরাণ নামেই প্রসিদ্ধ । সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মাহাত্ম্য লইয়াই এই পদ্মাপুরাণ রচিত হইয়াছে । সর্প পূজা একদা সমগ্র ভারতে প্রচলিত ছিল । প্রাচীন যুগে আদিম মানব সমাজে সর্প উপাসনার সন্ধান পাওয়া যায় । প্রাচীন কালে ব্যাঘ্র সর্প প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীকে ভয় করিত এবং আত্ম-রক্ষার জন্য সেইসকল জীবজন্তুকে পূজা করিত । ভারতীয় সাহিত্য বেদ, মহাভারত, পুরাণ, জাতক এবং অন্যান্য গ্রন্থে সর্পপূজার কথা তৎসহ নাগগণের কথাও লিপিবদ্ধ হইয়াছে । নাগ অর্থে সর্প এবং জাতি উভয়কে বুঝায় । আর্যগণ সর্পপূজক জাতি-গণকে নাগ বলিয়াছেন । এই নাগগণ নিজেদের সর্পের বংশোদ্ভূত বলিয়া মনে করিতেন (totem)।[১৮] কেহ কেহ মনে করেন নাগগণ জন্মগতভাবে সর্প ছিলেন না, কিন্তু সর্পপূজক ছিলেন ।[১৯] ভারতে সর্পপূজা এককালে অতি জনপ্রিয় ছিল । ইহার জনপ্রিয়তা সম্পর্কে বলা হইয়াছে "... in no other part of the world is more widely distributed or developed in more varied and interesting forms."[২০]

ভারতের অস্ট্রিক গোষ্ঠী অপেক্ষা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মধ্যে সর্পপূজার অধিক প্রচলন দেখা যায় । বৃহত্তর আসামের কোন কোন স্থানের আদিবাসিগণের মধ্যে এখনও সর্পপূজার প্রচলন আছে । ভারতে আর্য এবং নাগ জাতির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব হইয়াছিল তাহা totem এবং Race এর দ্বন্দ্ব ।[২১] আর্যগণ অনার্য যেসব সংস্কার ও আচার বিচার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে সর্পপূজা উল্লেখযোগ্য ।

খ্রীষ্টীয় শতাব্দী হইতেই নাগপূজা উত্তর ভারতে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। গ্রীক পর্যটকগণ যাহারা ভারতে আসিয়াছিলেন তাহারা দেশে ফিরিয়া যে বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতে সর্পপূজার বর্ণনা আছে।[২২] ঋগ্বেদে যে 'অহির্বুধ্ন্য' - এর উল্লেখ আছে, তাহা সর্পভিন্ন অন্য কিছু নহে। যজুর্বেদে সর্পের প্রত্যার্পণ উল্লেখ আছে। 'আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে' যে সর্পদেবতার যে পূজাবিধি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই পরবর্তীকালে নাগপঞ্চমী বলিয়া হিন্দুসমাজে গৃহীত হইয়াছে।[২৩] মহাভারতে নাগজাতি, কদ্রুর গর্ভে বাসুকি প্রভৃতির জন্মকাহিনী, জরৎকারু ঋষির সঙ্গে বাসুকি-ভগিনীর বিবাহ, তাহাদের সন্তান আস্তিক কর্তৃক জনমেজয়ের সর্পসত্র হইতে সর্পকুলকে রক্ষা প্রভৃতির বর্ণনা আছে। সর্পপূজা বা সর্পজীবকে (totem) বিশ্বাসী নাগজাতির উল্লেখ প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব ও গ্রন্থে পাওয়া যায় এবং এই সর্পপূজা অদ্যাপি, সমাজের নিম্নস্তরে ও উচ্চস্তরে সমভাবে বিদ্যমান।

আলোচ্য বিষয়, সর্পের অধিষ্ঠাত্রী মনসাদেবী সম্পর্কে দুই এক কথা বলা যাউক। প্রাচীন গ্রীসে সর্পভূষণা "মেডুসা" দানবীর বর্ণনা আছে। মনসা নামটি ঋগ্বেদে আছে[২৪]; বৈয়াকরণ চন্দ্র গোস্বামী 'মনসাদেবী'র উল্লেখ করিয়াছেন। বৌদ্ধগ্রন্থ 'বিনয়বস্তুতে' মহামায়ূরী বিদ্যা সূত্রে "অমলে বিমলে নির্মলে মনসে" বলিয়া মনসাদেবীকে সম্বোধন করা হইয়াছে। সাধনমালায় সর্পের দেবী সম্পর্কে অনেক কৌতূহলজনক বিবরণ রহিয়াছে।[২৫] তান্ত্রিক বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে মনসা ও তদনুরূপ সর্পাধিষ্ঠাত্রী দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় 'কুরুকুল্লা ও জাঙ্গুলী' দেবীর বর্ণনায়। দেখা যায় কুরুকুল্লাদেবী সর্পের ও সর্পবিষের নিয়ন্ত্রী। সাধনমালায় জাঙ্গুলী তারা-দেবীর বিস্তৃত পরিচয় আছে। বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সমাজে অতি প্রাচীনকাল হইতে সর্পের দেবী জাঙ্গুলী উপাসনার উল্লেখ দেখা যায়। সে যুগে সর্পের চিকিৎসককে 'জাঙ্গুলিক' বলিত।[২৬] অর্থাৎ বৈদিক যুগ হইতে বৌদ্ধযুগ পর্যন্ত নানা সূত্রে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা বিষনাশিনী দেবীর কোথাও স্পষ্ট, কোথাও বা অস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। বঙ্গের মনসামঙ্গলের মনসাকে নানা নামে (পদ্মাবতী, কেতকা, বিষহরী, জরৎকারু) অভিহিত করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে বিপ্রদাসের মনসাবিজয়ে 'জাগুলি' নামটাও পাওয়া যায়। 'সাধনমালার' জাঙ্গুলী যে বাংলার মনসামঙ্গল কাব্যে জাগুলিতে পরিণত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে মনসা নাম খুব কমই পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তী পুরাণসমূহে মনসার উল্লেখ ও ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা লক্ষ করিবার মত। দশম হইতে দ্বাদশ শতকে রচিত পুরাণে কোন কোন স্থানে মনসা সম্বন্ধে বিস্তারিত উল্লেখ দেখিতে পাই। কশ্যপ ঋষির মন হইতে সৃষ্ট — এই জন্য মনসা নাম হইয়াছে। মধ্যযুগে বঙ্গের বাহিরেও মনসাদেবীর মন্দিরের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে। আদিবাসীগণ এখনও মনসা পূজা করে। রাঁচির ওঁরাও জাতিরা এখনও মনসামন্দিরে মুরগী বলি দিয়া থাকে। কুর্মী, হো প্রভৃতি আদিবাসীর মধ্যেও মনসা পূজার রীতি প্রচলিত আছে।[২৭] দক্ষিণ ভারতে নাগম্মা, মুদাম্মা, মঞ্চাম্মা প্রভৃতি সর্পদেবীর পূজা এখনও চলে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে [২৮] মঞ্চাম্মা হইতে মনসা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। দেবী ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে মনসা নামের উল্লেখ ও বিস্তারিত পরিচয় আছে। এই পুরাণসমূহ একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলিয়া মনে হয় না।

তাই অনুমান হয় যে খ্রীষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দী হইতে বঙ্গদেশে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা শিল্পে ও সংস্কৃত পুরাণে স্বীকৃতি লাভ করে এবং চৈতন্যদেবের সময়ে বঙ্গের শিক্ষিত সমাজেও বিষহরীর পূজা অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করে।[২৯] ইহার পূর্ব হইতে মনসা-পূজকগণ সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তখন হয়তো সমাজে শৈব মতাবলম্বীর সংখ্যাধিক্য ঘটিয়াছিল, কিন্তু ক্রমে মনসা-পূজকগণ সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল — তাহাই মনসামঙ্গল কাব্য হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

মনসামঙ্গলের কবিগোষ্ঠী

চৈতন্যযুগে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর সমাপ্তিকালের মধ্যে মনসামঙ্গলের যে কয়জন কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে কানা হরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপলাই ও নারায়ণদেবের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মূল আলোচ্য বিষয় নারায়ণদেবের মনসামঙ্গল ও অসমীয়া নারায়ণদেবের সুকনান্নী কাব্য। তবু যুগের মানসিকতা, পরিবেশ মনসামঙ্গলের

ব্যাপকতা বুঝিবার জন্য উভয় কাব্যেরই সমসাময়িক মনসা-কবিগণের পরিচয় জানা আবশ্যক। দ্বিজ বংশীদাসের গ্রন্থের মুদ্রিত সংস্করণে যে সব তারিখ বাচক পয়ার আছে তাহা হইতে ১৪৯৭ শক (১৫৭৫ খ্রী: অ:) পাওয়া যায়। তাই তাঁহার গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হইল না।

কানা হরিদত্ত

কবি বিজয়গুপ্তের রচিত পুস্তকে কানা হরিদত্ত সম্পর্কে কয়েকটি পয়ার শ্লোক আছে। প্যারীমোহন দাসগুপ্ত বরিশাল হইতে বাংলা ১৩০৮ সালে বিজয়-গুপ্তের মনসামঙ্গলের যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন (প্রথম সংস্করণ ১৩০৩ সালে প্রকাশিত), তাহার স্বপ্নাধ্যায় নামক পালায় আছে যে মনসা রাত্রিকালে বিজয়-গুপ্তকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন :

মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত॥
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে।
যোড়াগাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোর ছলে॥
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর॥
গীতে মতি না দেহ কেহ মিছে লাফ ফাল।
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল॥

এইজন্য দেবী মনসা বিজয়গুপ্তকে বিশুদ্ধতর কাব্য রচনা করিতে আদেশ করিলেন –

মোর বরে তুমি হও সাবহিত।
নানা ছন্দে নানা রাগে রচ মোর গীত॥

এই পয়ার কয়টি বিজয়গুপ্তের রচিত হউক আর নাই হউক, ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, কানা হরিদত্তের তথাকথিত কাব্য দেবী মনসার পছন্দ হয় নাই। সুতরাং এই প্রমাণ দৃষ্টে তাঁহাকে কেহ কেহ মনসামঙ্গলের আদিতম কবি বলিতে চাহেন। বিজয়গুপ্তের সময়েই হরিদত্তের গীত লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে

জোড়াগাঁথা নাই (ছন্দের ত্রুটি), শব্দযোজনা সুশ্রাব্য নহে, মিত্রাক্ষরও ত্রুটিজনক। দেবীর মিত্রাক্ষর বিশুদ্ধির প্রতি বোধ হয় একটু অতিরিক্ত ঝোঁক ছিল। বিজয়-গুপ্তকেও তিনি বর দিয়া বলিয়াছিলেন :

মনে কিছু না ভাবিও মুই দিলাম বর।
না বুঝিয়া বল যদি হবে মিত্রাক্ষর ॥[৩৭]

কিন্তু এ পর্যন্ত কানা হরিদত্ত রচিত কোন মনসামঙ্গল কাব্য পাওয়া যায় নাই — বিজয়গুপ্তের সময়ে নষ্ট হইয়া গেলে এখন আর তাহা কোথায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে ?

ড: দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ও বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়ে' হরিদত্তের ভণিতা যুক্ত 'পদ্মার সর্পসজ্জা' নামক একটু দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। দক্ষিণা-রঞ্জন মিত্র মজুমদার ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত দিঘাপইৎ গ্রামে মনসামঙ্গলের একটি প্রাচীন পুঁথি পাইয়াছিলেন ; তাহাতেই নাকি হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত একটি কবিতা ছিল। সেইটি বোধহয় দীনেশচন্দ্র উল্লিখিত 'পদ্মার সর্পসজ্জা'। উক্ত পুঁথি প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন বলিয়াছেন, "সম্প্রতি ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত দিঘা-পইৎ গ্রামে একটি প্রাচীন মনসামঙ্গল কাব্য হইতে হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত একটি কবিতা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই হরিদত্ত পূর্ববঙ্গের কবি ছিলেন বলিয়া আমাদের ধারণা। সুলেখক শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার কর্তৃক হরিদত্তের এই পুঁথিখানির উদ্ধার হইয়াছে।[৩৮]

হরিদত্তের ভণিতায় 'পদ্মার সর্পসজ্জা' নামক যে কয় ছত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

দুই হাতের শঙ্খ হইল গরল সঙ্খিনী।
কেশের জাত কৈল এ কালনাগিনী ॥
সুতলিয়া নাগ কৈল গলার সুতলি।
দেবী বিচিত্র নাগে কৈল হৃদয়ে কাঁচুলী ॥
সিন্দুরিয়া নাগে কৈল সিথের সিন্দুর।
কাজুলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর ॥[৩৯]

প্যারীমোহন দাসগুপ্ত সম্পাদিত বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে (২ সং পৃ. ২০১) পুত্র হারাইয়া চান্দের যে বিলাপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার ভণিতায় হরিদত্তের জবানী রহিয়াছে ।

ক্ষীরোদ জলে চান্দ   নধাইরে ভাসাইয়া
বিস্তর করেছে বিষাদ
পুত্র পুত্রবধূ   জলেতে ভাসাইয়া
কি মোর জীবনে সাধ ।।
বাণিজ্য করিয়া   পাইলাম হীরামন মাণিক্য
সম্পূর্ণ চৌদ্দখানি ভরা ।
মনসা পরিবাদে   সকলি হারাইলাম
আপনি আসিলাম একা ।।
কানা হরিদত্ত   নাচারির ছন্দ
শ্রীপুরুষোত্তমে গায় ।।

যাহা হউক কানা হরিদত্ত কোন কবি হউন, আর গায়েনই হউন — এই নামে মনসা-মঙ্গলের কোন এক কবি কখনও বর্তমান ছিলেন বলিয়া মনে হয় । বিজয়গুপ্ত তাহার কাব্যের ত্রুটি দেখাইতে গিয়া 'নাফ', 'ফান' শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন ; এই শব্দ বিপর্যয়টি পূর্ব-বঙ্গে অঞ্চল বিশেষে এখনও দেখা যায় । কাজেই হরিদত্ত নামীয় কোন কবি নিশ্চয় পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন । বিজয়গুপ্তের অন্যান্য পুঁথিতেও কানা হরিদত্তের উল্লেখ আছে । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারায়ণদেবের একখানি প্রাচীন পুঁথিতে (পুঁথি - ৬৫৩৭) হরিদত্তের ভণিতা পাওয়া গিয়াছে ।

পদ্মার চরণে পতি হরিদত্তে কয় ।
মনসা পূজিলে সভে ধনপুত্র পায় ।।

ডঃ সুকুমার সেন অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে লিখিত বৈদ্য হরিদাসের ভণিতা যুক্ত মনসামঙ্গলের একখানি পুঁথির উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন — 'এই হরিদাস — হরিদত্ত পুরুষোত্তম উল্লিখিত 'কানা হরিদত্ত' হইতে বাধা নাই । তবে তাঁহার কাল যে অষ্টাদশ শতাব্দের আগে হইবে এমন মনে করিবার পক্ষে কোন যুক্তি

নাই ।[৩৩] এই হরিদত্ত যদি অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী না হন, তাহা হইলে বর্তমান প্রসঙ্গে তাহার আলোচনার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ তাহা হইলে মনসা-মঙ্গলের আদি কবিরূপে তাঁহাকে গণনা করা যাইবে না । কিন্তু বিজয়গুপ্তের নানা পুঁথিতে এবং নারায়ণদেবের একটি পুঁথিতে হরিদত্তের ভণিতা আছে । সুতরাং কানা হরিদত্তের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে তাহাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। অবশ্য হরিদত্ত প্রাচীন যুগের কোন গায়েনও হইতে পারেন ।[৩৪] নানা স্থানে যখন তাঁহার উল্লেখ দেখা যাইতেছে, তখন তাঁহাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না বটে ; কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে এ পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য কোন তথ্যই সন্ধান করা যায় নাই ; তাঁহার অস্তিত্বে সন্দেহ না হইলেও আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে ঘোরতর সংশয় রহিয়াছে ।

<u>বিজয়গুপ্ত</u>

বঙ্গদেশের মনসামঙ্গলের কবিদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের ও পূর্ববঙ্গের বিজয়গুপ্তের কাব্যের প্রচার হইয়াছিল সর্বাধিক । ছাপার অক্ষরেও এই দুই কাব্য অনেক পূর্ব হইতে মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে । বিজয়গুপ্তের কাব্য পূর্ববঙ্গে এত অধিক চলিয়াছিল যে গায়েন ও লিপিকারদের হস্তক্ষেপের ফলে বিজয়গুপ্তের মূল রচনার অতি অল্পই রক্ষা পাইয়াছে । এখনও বরিশাল এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে 'রয়ানী' (রজনী) নামে বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল গীত হয় । বিজয়গুপ্তের প্রাপ্ত পুঁথিগুলির মধ্যে বহুস্থানে কর্ণপুর, বর্ধমান দাস, চন্দ্রপতি হরিদত্ত, পুরুষোত্তম, জানকীনাথ, দ্বিজ কমলনয়ন প্রভৃতি ভণিতা দেখিয়া মনে হয় কাব্যটি প্রায়শ:ই 'Composit Text' -এ পরিণত হইয়াছে ।

বরিশালের শিক্ষক প্যারীমোহন দাসগুপ্ত ১৩০৩ সনে প্রথম বরিশাল হইতে বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ প্রকাশ করেন । তাহার পর ১৩০৮ সনে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় । দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে প্রকাশক অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন, "কয়েকখানা আসল প্রাচীন গ্রন্থ দৃষ্টে এবার কিছু কিছু পরিবর্ধিত ও প্রাচীন কালের ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দের সহজবোধ্য অর্থ সন্নিবিষ্ট হইল ।" দাশগুপ্ত মহাশয় ভূমিকায় কবির কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে তিনি

১০-১২ খানি তুলট কাগজের পুস্তক পাঠ করিয়া গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন। তাঁহার মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : "আমাদের দেশে যতখানি পুস্তক পাইয়াছি তাহার মধ্যে অধিকাংশই প্রায় একরকম। অনুলিপিকারগণের ভ্রমবশত: স্থানে স্থানে অতি সামান্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু ভিন্ন গ্রামের পুস্তকের মধ্যে অনেক অনৈক্য দেখা যায়। কেহ কেহ নিজ নিজ মতনবসিদ্ধির জন্য ইহার অনেক স্থলে অন্য কবির কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। কেহ বা নিজ শক্তির পরিচয় দেওয়ার জন্য স্বরচিত কবিতা অথবা গ্রন্থস্থ কোন অংশের পরিবর্তে স্বরচিত পদ সকল ভরিয়া দিয়াছেন।" ভিন্ন গ্রামের পুঁথিতে প্রক্ষেপ থাকিতে পারে, এই ভয়ে প্যারীমোহন তাঁহার নিজগ্রামের পুঁথির পাঠকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য মনে করিয়াছিলেন — কারণ তাহার গ্রাম গৈলায় (প্রাচীন ফুল্লশ্রী) বিজয়গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। একথা যুক্তির দিক দিয়া পুরাপুরি মানিলেও বলিতে পারি, প্যারীমোহন ইচ্ছা করিয়া পাঠ বদলাইয়া আধুনিক শব্দ ছাপিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। মুদ্রিত গ্রন্থের মধ্যে যে সমস্ত আধুনিক শব্দ রহিয়াছে তাহা পুঁথির লিপিকার অথবা গায়েনগণের দ্বারা হইয়াছে — প্যারীমোহন এজন্য দায়ী নহেন।

এখানে প্যারীমোহন সম্পাদিত বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণের দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠের সঙ্গে ১২৪২-৪৪ সনের মধ্যে অনুলিপিকৃত একখানি পুঁথির পাঠের তুলনা দেওয়া যাইতেছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ১২৪২-৪৪ সনের পুঁথি :

১) শ্রাবণ মাসে রবিবার মনসা পঞ্চমী।
তিতিয় প্রহর রাত্রি নিদ্রা জায়ে প্রাণী ॥
নিদ্রার আবেশে না জাগে কোন জন।
হেনকালে বিজয়ে পোস্তে দেখীল সপন ॥
গৌর বর্ণ সুরির ব্রাহ্মণের নারি।
রত্ন ময়ে অলঙ্কার দিব্ব বস্ত্র পড়ী ॥
তপ্ত কাঞ্চন হেন সুরিলে যুতী।
অতী মনুষ্রীকান্তি পরম যুবতী ॥

প্যারীমোহন-সম্পাদিত বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণের দ্বিতীয় সংস্করণ ॥

১) শ্রাবণ মাসের রবিবারে মনসাপঞ্চমী ।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি নিদ্রা যায় স্বামী ॥
নিদ্রায় আকুল লোক না জাগে একজন ।
হেন কালে বিজয়গুপ্ত দেখিল স্বপন ॥
গৌরবর্ণ শরীর এক ব্রাহ্মণের নারী ।
রত্নময় অলঙ্কার দিব্যবস্ত্র ধারী ॥
তপ্ত কাঞ্চন যেন শরীরের জ্যোতি ।
ইন্দ্রের শচী কিম্বা মদনের রতি ॥

বিচার করিলে দেখা যায় যে, ছাপা গ্রন্থ ও পুঁথির পাঠে বেশ কিছু পার্থক্য আছে, কিন্তু একেবারে আমূল পরিবর্তিত হইয়াছে বলা যায় না ।

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণের রচনাকাল লইয়া রীতিমতো সংশয় সৃষ্টি হইয়াছে । এ পর্যন্ত যত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহার সবগুলিতে সন-তারিখ নাই । যেগুলিতে আছে, তাহাতেও একের সঙ্গে অপর পুঁথির তারিখের ঐক্য নাই । সম্পাদক প্যারীমোহন বলিয়াছেন যে, তাঁহারা লোকপরম্পরায় শুনিয়াছিলেন যে, ১৪০৬ শকাব্দে (১৪৮৪ খ্রীঃ) এই কাব্য রচিত হইয়াছিল । যে সমস্ত 'রয়ানীর' দল এই গান গাহিয়া বেড়াইত, সম্পাদক তাহাদের কাছেও এই ১৪০৬ শকাব্দের কথাই শুনিয়াছিলেন । তিনি কয়েকখানি পুঁথিতে যে সন-তারিখের উল্লেখ পাইয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে —

১) ঋতুশশী বেদশশী শক পরিমিত । (১৪১৬ শক - ১৪৯৪ খ্রীঃ)

২) ছায়াশূন্য বেদশশী পরিমিত শক ।
সনাতন হুসেন সাহা নৃপতি তিলক ॥ (১৪০০ শক - ১৪৭৮ খ্রীঃ)

৩) ঋতুশূন্য বেদশশী পরিমিত শক
সুলতান হুসেন সাহা নৃপতি তিলক ॥ (১৪০৬ শক - ১৪৮৪ খ্রীঃ)

আমরা ১৮৩৭ খ্রী: অব্দের পুঁথিতে সন-তারিখের পয়ারটি পাইয়াছি –

ঋতু শিখে বেদ শশি পরিমিত শক ।
সুলতান হুসেন রাজা পৃথিবী পালক ॥

নিশিকান্ত সেন কোন কোন পুঁথিতে "ছায়া শূন্য বেদশশী পরিমিত শক" অথবা "ঋতু শূন্য বেদশশী পরিমিত শক" — এই সমস্ত পাইয়াছেন ।[৩৫] দেখা যাইতেছে যে বিজয়গুপ্তের অনেকগুলি পুঁথিতে সন তারিখের উল্লেখ আছে, কিন্তু তারিখগুলির মধ্যে ঐক্য নাই । উল্লিখিত পয়ারের প্রথমটিতে ১৪১৬ শক (১৪৯৪ খ্রী:), দ্বিতীয়টিতে ১৪০০ শক (১৪৭৮ খ্রী:) এবং তৃতীয়টিতে ১৪০৬ শক (১৪৮৪ খ্রী:) পাওয়া যাইতেছে । নিশিকান্ত সেন কোন কোন পুঁথিতে যে তারিখ দেখিয়াছেন তাহাতেও নানা অনৈক্য ও সংশয় আছে । এই সনগুলির মধ্যে প্রথমটি হইতেছে ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দ । ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহ গৌড়ের সুলতান হইয়াছিলেন । তাহার বৎসরখানেকের মধ্যেই বিজয়গুপ্ত এই কাব্য রচনা করিয়া থাকিবেন । কারণ, ঐ পয়ারে হুসেনের নাম আছে । অন্য সনগুলিতে নিশ্চয় ভুল আছে । কারণ, ১৪৭৮ বা ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে হুসেনকে বাংলার সিংহাসনে পাওয়া যায় না । বিজয়গুপ্ত হুসেন শাহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া প্রথম পয়ারের সনটি (১৪১৬ শক বা ১৪৯৪ খ্রী:) কাব্য রচনার সন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে ।

বিজয়গুপ্তের কোন কোন পুঁথিতে কবির যৎসামান্য পরিচয় পাওয়া যায় । বরিশালের গৈলা গ্রামে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল । এই গ্রামটির প্রাচীন নাম মানসী, তারপর ইহা ফুল্লশ্রী নামে পরিচিত হয় । বিজয়গুপ্ত ফুল্লশ্রীর কথাই বলিয়াছেন । গুপ্ত কবির বর্ণনা অনুসারে এই গ্রামের পশ্চিমে ঘাঘরা নদী এবং পূর্বে ঘন্টেশ্বর নদ । ঘাঘরা নদী এখনও বিলের আকারে বর্তমান আছে, ঘন্টেশ্বরের চিহ্নও দেখা যায় । এই গ্রামে বিজয়গুপ্তের মনসাবাড়ী (মনসা মন্দির) এবং এই মন্দিরে পিতলের মনসা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে । কবি বিস্তারিত ভাবে ফুল্লশ্রী গ্রামের বর্ণনা দিয়াছেন ; নিজের সম্বন্ধে তিনি সনাতন তনয় রুক্মিণী গর্ভজাত ভিন্ন কোন পরিচয় দেন নাই ।

অনেকের মতে বিজয়গুপ্ত মনসামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি । আবার অনেকে এই সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন । নারায়ণদেবের কাব্য পাঠ করিলে বিজয়গুপ্তের মুদ্রিত গ্রন্থকে অত্যন্ত দুর্বল, শিথিল এবং ব্রতকথা-ছড়া ব্যালাডের সমন্বয়ে সৃষ্ট বিশৃঙ্খল কাহিনী বলিয়া মনে হইবে । প্রথমত কাহিনীতে কোন প্রকার সামঞ্জস্য দেখা যাইবে না । মনসা-চণ্ডী-শিবের আখ্যানটুকু অনাবশ্যক এবং অনর্থক অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে । চান্দ সদাগরের বাণিজ্য, বদন-বাণিজ্য ও দুর্গতির বর্ণনা নিতান্তই গতানুগতিক — কয়েক শতাব্দী পূর্বের উপকূল বাণিজ্যের ক্ষীণ স্মৃতি । বেহুলার স্বামী দেহ সহ গারুড়ীর সন্ধানে যাত্রা, পথের প্রলোভন জয়, স্বর্গে গিয়া মহাদেবাদি দেবতাদিগকে নৃত্যগীতে খুশি করিয়া স্বামী ও ভাসুরদের জীবন-সংগ্রহ এবং শ্বশুরের নিমজ্জিত তরণী উদ্ধারের কাহিনীতে বৈচিত্র্য না থাকিলেও স্বচ্ছ বর্ণনা-ভঙ্গিমা কথকতা ও পাঁচালীর রীতিকে স্মরণ করাইয়া দেয় । মনসার ঈর্ষাকে নেতা যেভাবে কুটিল পথে চালনা করিয়াছে এবং রুষ্টা দেবীর ক্রোধকে অভীষ্ট পথে লইয়া গিয়াছে, তাহাতে সমগ্র কাব্যের কাহিনীটি যেন তাহারই করধৃত সূত্রে পরিণত হইয়াছে ।

চরিত্র বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, দেব-দেবীর চরিত্রে কোন প্রকার মহিমা রক্ষিত হয় নাই । চণ্ডী-মনসা-গঙ্গার কোন্দল কলহবিদ্যা-পটীয়সী জনপদ-বধূদিগকেও লজ্জা দিবে । মহাদেবের গঞ্জিকা-ধুস্তুর-সেবী কামলম্পট চরিত্র প্রায় সমস্ত শাক্ত মঙ্গলকাব্যে একভাবে চিত্রিত হইয়াছে । বাংলা দেশে কৃষিজীবী আদিম অস্ট্রিক ধারার অনুসারে শিবঠাকুরের চরিত্র মনসা-চণ্ডীমঙ্গল ও শিবায়নে যে-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে গ্রামীণ মনোভাবটি বাস্তবধর্মী স্থূল রেখায় স্পষ্ট ফুটিয়াছে। বৃদ্ধবয়সেও শিবের কামলোলুপতা প্রচুর । পুষ্পবনে পুষ্প তুলিতে গিয়া

কামে ব্যাকুল শিব   কাতর চঞ্চল জীব
রতি রসে করে ঢলমল ।
অতি কামে হৈয়া ভোল   শ্রীফল বুকে দিল কোল
আচম্বিতে খসিল মহারস ।।

নিজ মানসকন্যা মনসাকে দেখিয়া শিবের উত্তেজনা :

কামভাবে মহাদেব বলে জন চিত ।
লজ্জায় বিকল পদ্মা শুনিতে কুৎসিত ॥
নাকে হাতদিয়ে পদ্মা বলে রাম রাম ।
শিবের চরণে পড়ি করিল প্রণাম ॥
পদ্মা বলে বাপ তুমি পরম কারণ ।
না বুঝিয়া বল কেন কুৎসিত বচন ॥

বৃদ্ধ স্বামীর পরস্ত্রী-আসক্তির জন্য চণ্ডীর বিলাপ :

চণ্ডী বলে সখী মোর দুঃখের নাহি ওর ।
বৃদ্ধকালে স্বামী মোর পরনারী চোর ॥

ডোমনীবেশিনী চণ্ডীর প্রতি পরস্ত্রী বোধে মহাদেবের কদর্য আসক্তি, মনসাকে দেখিয়া ঋষি জরৎকারুর কামাবেশ ("কামবাণে মোহিত হইল জরৎকারু"), স্বর্গে নৃত্যরতা বেহুলাকে দেখিয়া মহাদেবের কামাভিলাষ ("যৌবন দান কর মোরে ভজ মোর ঠাঁই") প্রভৃতি চিত্র মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের কবিদের দীন কল্পনাই সূচিত করিতেছে।

চান্দসদাগরের চরিত্রে কিছু কিছু মহত্ত্বগুণের সমাবেশ হইলেও শৃঙ্গার-রসের ব্যাপারে কবি বিজয়গুপ্ত চাঁদকেও নিতান্ত সামান্য ব্যক্তিরূপে আঁকিয়াছেন । ছদ্মবেশিনী-মনসার রূপে কামাবেশ বশে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অবস্থায় চান্দ কর্তৃক মনসাকে মহাজ্ঞান দান তাঁহার চরিত্রকে কলঙ্কিত করিয়াছে । বাণিজ্য-তরণী ডুবিয়া গেলে দারুণ দুঃখে পড়িয়া চারিপণ (চারি আনা) কড়ি পাইয়া চাঁদ বলিতেছেন —

একপণ কড়ি দিয়া ক্ষৌর শুদ্ধি হব ।
আর এক পণ কড়ি দিয়া চিরা কলা খাব ॥
আর একপণ কড়ি নিয়া নটি বাড়ী যাব ।
আর একপণ কড়ি নিয়া সোনেকারে দিব ॥

বহুদিন পরে বাড়ী ফিরিয়া ঘরে লখীন্দরকে দেখিয়া সোনেকার চরিত্রে চান্দের সন্দেহ — (সুরূপ পুরুষ দেখি পুরীর ভিতর) । বেহুলার বিবাহে সমাগত স্ত্রীগণের

পতিনিন্দা প্রভৃতিতে কবি রুচির মূল্য রক্ষা করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। অবশ্য ইহা মধ্যযুগের সাহিত্যে একটি বিশেষ লক্ষণ বলিয়া চিহ্নিত।

মনসা-চরিত্রে একটি স্থান ছাড়া অন্য কোথাও মানবিক গুণের বিকাশ হয় নাই। যেখানে জরৎকারু ঋষি তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, সেখানে তাঁহার উক্তি অল্পস্বল্প করুণ রস সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে :

জনম দুঃখিনী আমি দুঃখে গেল কাল।
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল॥
শীতল ভাবিয়া যদি পাষাণ লই কোলে।
পাষাণ আগুন হয় মোর কর্মফলে॥

এই সামান্য কয় ছত্র বাদ দিলে মনসা-চরিত্রে ঈর্ষাতুর নীচতাই প্রাধান্য পাইয়াছে। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল বহুদিক দিয়া উত্তম কাব্যগুণান্বিত না হইলেও কোন কোন চরিত্র ও ঘটনার বর্ণনাতে উচ্চস্তরের কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বেহুলার সৌন্দর্য্য বর্ণনা –

চাচর মাথার কেশ চন্দন ললাটে।
পূর্ণিমার চাঁদ যেন রাহুর নিকটে।
দশন মুকুতা পাঁতি অধরে তাম্বুল।
নাসিকা নির্মাণ দেখি যেন তিলফুল॥
নিতম্ব যুগল যেন নয়নে কাজল।
কমল উপরে যেন ভ্রমর যুগল॥
অর্ধোত্থিত স্তনদ্বয় শোভে হৃদিপরি।
সরোবর মধ্যে যেন কমলের কড়ি॥

পুত্র হারাইয়া চাঁদের গম্ভীর বিলাপ এবং সোনেকাকে সান্ত্বনা দানের চেষ্টা মাইকেল মধুসূদনের রাবণের বিলাপ ও মন্দোদরীকে সান্ত্বনা দানের চিত্রকে স্মরণ করাইয়া দেয়। চাঁদ সদাগর পত্নী সোনেকাকে বলিতেছেন –

শীতল চন্দন যেন আভের ছায়া।
কার জন্য কান্দ প্রিয়া সকল মিছা মায়া॥

মিছামিছি বলি কেন ডোকর তোমার ।
যে দেখিল লখীন্দর সে দিন তারবার ।।

ইহা নির্বেদ সান্ত্বনাতীত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে । তবে মনসার মাহাত্ম্য বৃদ্ধির জন্য এই বণিকের চরিত্রের সঙ্গতি বহুস্থলে নষ্ট করা হইয়াছে । বাণিজ্যে গিয়া মনসার চক্রান্তে তাঁহার দুর্দশার বর্ণনা অসঙ্গত, অযথার্থ, অপ্রাসঙ্গিক ও হাস্যকর হইয়াছে । ইহাতে মনসার মহিমা বৃদ্ধি পায় নাই, চাঁদের চরিত্রও একেবারে নষ্ট হইয়াছে । সর্বশেষে সকলের অনুরোধেও চাঁদ পুনরায় মনসা পূজা করিতে চাহিলেন না –

ধনে জনে কার্য নাহি যাউক আর বার ।
পদ্মা না পূজিব আমি কহিলাম সার ।।

তখন স্বয়ং চণ্ডী তাঁহাকে নির্দেশ দিলেন, "একই মূর্ত্তি দেখ সব না ভাবিও আর" – এবং চাঁদ যখন দেখিলেন,

এক রথে পদ্মা দুর্গা অন্তরীক্ষে স্থিতি ।
দুই জনে দেখে চান্দ একই মূরতি ।।

তখন চণ্ডী ও মনসার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই জানিয়া চাঁদ বুঝিতে পারিলেন –

এমন মূরতি আমি কভু দেখি নাই ।
এত কাল মোরে কেন না বলিলা ভাই ।।
যেই মুখে বলিয়াছি লঘু জাতি কানী ।
সেই মুখে ভস্ম দেও জগৎজননী ।।

সুতরাং কোন কোন সমালোচক মনে করেন যে দেবীর মহিমা প্রচারের জন্য বিজয়গুপ্ত চান্দের চরিত্রটির পরিণতি নষ্ট করিয়া কাব্যের ভরাডুবি করিয়াছেন ।

বিজয়গুপ্ত মনসাভক্ত ছিলেন ; চাঁদ সদাগর ছিলেন শৈব । অথচ এই কাব্যে বিষ্ণু ও চন্ডিকার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ পাওয়া যায় । কবি কাব্যারম্ভ করিয়াছেন "গরুড় বাহনে বন্দম বিষ্ণুর চরণ" বলিয়া । হরিহর নারায়ণ স্মরয়ে গোবিন্দ", "হরি ভজিবার সময় যায় বহিয়া", "জনমে জনমে হই রাধা কানুর

দাস" প্রভৃতি অজস্র স্থানে রাধাকৃষ্ণ ও বিষ্ণু-হরির উল্লেখ আছে। এ সমস্ত উল্লেখ পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত না হইলে ইহার দ্বারা চৈতন্য প্রভাবের পূর্বেই বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্মের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে চৈতন্যের পূর্বে ১৪শ-১৫শ শতাব্দীতে বঙ্গ-সমাজে তান্ত্রিক শাক্ত মতের সঙ্গে কিছু কিছু বৈষ্ণব মতও ছিল। কাজেই সমস্ত মনসামঙ্গল কাব্যেই রাধাকৃষ্ণ বা বিষ্ণু হরির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বিজয়-গুপ্তের মন কিয়দংশে বৈষ্ণবভক্তির অনুকূল ছিল।

বিপ্রদাস পিপলাই

বিপ্রদাসের কাব্যে স্পষ্টত: সন-তারিখের নির্দেশ পাওয়া গিয়াছে।

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন শাহ গৌড়ের প্রধান।।

সেই হিসাবে আমরা বিজয়গুপ্তের পরে চব্বিশ পরগণা জেলার বাদুড়িয়া গ্রামে আবির্ভূত বিপ্রদাস পিপলাই। কেহ কেহ বিপ্রদাসকে মনসামঙ্গলের একমাত্র, আদি ও অকৃত্রিম কবি বলিয়া উল্লসিত হইয়াছেন।[৩৬] কেহ বা এ কাব্যকে আদৌ প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন না, ইহার কাব্যবিচার করাও বাহুল্য মনে করিয়াছেন।[৩৭] নানা কারণে বিপ্রদাস সম্বন্ধে এইরূপ বিপরীত মত সৃষ্টি হইয়াছে। প্রধান কারণ পুঁথির পৃষ্ঠার গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা। নিম্নে সংক্ষেপে পুঁথি বিভ্রাটের কথা বলা হইল।

বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত বাদুড়িয়া গ্রামে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। কলিকাতার অদূরে দত্তপুকুর অঞ্চল হইতে তাঁহার কাব্যের তিনখানি পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তদানীন্তন বাঙ্গলা সরকার বিপ্রদাসের দুইখানি পুঁথি ক্রয় করেন। পুঁথির সংখ্যা যথাক্রমে — জি ৩৫২১ এবং জি ৩৫৩০। পুঁথি দুইখানি এখন এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে। ৩৫২১ সংখ্যক পুঁথিতে সন তারিখের উল্লেখ নাই; অনুমান অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইহার অনুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে।[৩৮] দ্বিতীয় পুঁথিতে (জি ৩৫৩০) পাতার গোলমাল আছে। মনে হয় দুইখানি পুঁথি একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। এই পুঁথিতে পাঁচজনের হস্তাক্ষর রহিয়াছে, তন্মধ্যে একজন নরসুন্দরও আছেন। তাই এই পুঁথির পাঠ সংশয়াতীত নহে। ১৭৪০ বা ১৭৫১ সালে ইহা

লিপিকৃত হইয়া থাকিবে । তৃতীয় পুঁথিখানি বর্ধমান সাহিত্য সভার ৪০৩ সংখ্যক পুঁথি, এটিও খন্ডিত । মূল পুঁথিটি কোথায় আছে জানা যায় না । চতুর্থ পুঁথিটি বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে আছে (পুঁথি সংখ্যা ১৮১৩) । এটি খন্ডিত নহে - সম্পূর্ণ । পুঁথিটি ১৮২৫ খ্রী: লিপিকৃত হয় । চারিখানি পুঁথির মধ্যে শেষোক্তটি ছাড়া আর সমস্ত পুঁথি খন্ডিত । পুঁথি তিনটি এমনভাবে খন্ডিত যে, বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনীই বাদ পড়িয়া গিয়াছে । পাঁচ রকমের হাতের লেখা পুঁথির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ দৃঢ়তর হয় । অর্বাচীন কালের শব্দের সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল ।

১। ছাড়িয়া যাবে মোরে কোথা (পৃ ৪৫)[৩১]

২। চিন্তাকুল দুই ভাই ভাবে সবিস্ময় (পৃ ৮৬)

৩। যেন খায় রাহু   পসারিয়া বাহু
দিবাকর শশী দেখি । (পৃ ১০৩)

৪। সূর্যের আতাপ যেন মৃণাল শুখায় (পৃ ১১৪)

৫। তোমার শক্রতু হইল মোর দৈব দোষে (পৃ ১১৪)

এই ভাষা কি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের রচনা হইতে পারে ? আরও একটু আধুনিক রচনাভঙ্গীর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে —

চাচর প্রচুর কেশ বাঁধিল করবী ।
নানা অলঙ্কার অঙ্গে মনিরত্ন ঝুরি ॥
চন্দন তিলক শোভে ললাটে সিন্দুর ।
নয়নে কজ্জল তাহে অলক প্রচুর ॥
দশন মুকুতা পাঁতি জিনিয়া ভ্রমর ।
অমিয়া বরিষে বিম্ব জিনিয়া অধর ॥

আরও একটি কারণে এই কাব্যের প্রাচীনত্বে বিশেষ সংশয় জন্মে । চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে ইহাতে কলিকাতা ও কাছাকাছি গ্রাম ও তীর্থের বর্ণনা আছে :

ডাহিনে হুগলি রহে বামে ভাটপাড়া
পশ্চিমে বাহিল বোরো পূর্বে কাকীনাড়া
মূলাজোড় গাড়ুলিয়া বাহিল সত্বর

পশ্চিমে পাইক পাড়া বাহে ভদ্রেশ্বর ।
চাঁপদানি ডাহিনে বামেতে ইছাপুর
বাহ বাহ বলি রাজা ডাকিছে প্রচুর ।
বামে বাঁকিবাজার বাহিয়া যায় রঙ্গে
ডাহিনে বহিয়া রাজা প্রবেশে দিগঙ্গে ।
পূজিল নিমাই তীর্থ (!) করিয়া উত্তম
নিমগাছে দেখে জবা ফুটি অনুপম ।
চানক বাহিয়া যায় বড়নিয়ার দেশ
তাহার মেলান বাহে আকনা মাহেশ ।
খড়দহে শ্রীপাট (!) করিয়া দণ্ডবত
বাহ বাহ বলি রাজা ডাকে অবিরত ।
রিসিড়া ডাহিনে বাহে বামে সুকচর
পশ্চিমে হরিষে রাজা বাহে কোননগর ।
ডাহিনে কোতরং বাহে কামারহাটী বামে
পূর্বেতে আঁড়িয়াদহ ঘুসুড়ি পশ্চিমে ।
চিতপুরে পূজো রাজা সর্ব মঙ্গলা
নিশিদিসি বাহে ডিঙ্গা নাহি করে হেলা ।
পূর্বকূল বাহিয়া এড়ায় কলিকাতা
বেতড়ে চাপায় ডিঙ্গা চাঁদো মহারথা । (পৃ ১৪৩-৪৪)

বিপ্রদাসের বর্ণনার ভাষা আধুনিক তো বটেই, অনেকগুলি গ্রাম জনপদের নামও আদৌ প্রাচীন নহে । 'আইন-ই-আকবরী'-তে সপ্তগ্রাম সরকারের অধীনে 'মহল কলকাত্তা'র উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে রচিত কোন কাব্যে এইরূপ উল্লেখ কিছু সন্দেহজনক । পরিহাসের বিষয় হইল — নিমাইতীর্থ এবং শ্রীপাট খড়দহের উল্লেখ । এই দুইটি গ্রাম চৈতন্যদেবের পরে ও প্রভাবে বিখ্যাত হইয়াছিল । রাম না হইতে রামায়ণ রচনা হয়তো সম্ভব, কিন্তু নিমাইয়ের পূর্বে নিমাইতীর্থ এবং নিত্যানন্দের পূর্বে শ্রীপাট খড়দহের সুস্পষ্ট উল্লেখ সম্ভব নহে । স্পষ্টতঃই এই বর্ণনা

প্রক্ষিপ্ত। বাধ্য হইয়া পুঁথি সম্পাদক বলিয়াছেন – "There is little doubt that the earlier narrative is a singer's elaboration made at a much later date."[৪০]

পুঁথির প্রথম পালার চতুর্থ স্তবকে কালজ্ঞাপক পয়ারটি লক্ষণীয় :

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি নৃপতি হুসেন সাহা গৌড়ের প্রধান ॥
হেন কালে রচিনা পদ্মার ব্রতগীত।
শুনিয়া চুবিদ লোক পরম - পীরিত ॥

অর্থাৎ ১৪১৭ শকে (১৪৯৫ খ্রীঃ) যখন হুসেন শাহ গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন এই গীত রচিত হয়। এই সন তারিখ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে এশিয়াটিক সোসাইটির দুইখানি পুঁথিতে পাওয়া যাইতেছে (জি ৩৫২১ এবং জি ৩৫৩৩) এবং বিশ্বভারতীর পুঁথিতে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং এই সনে অবিশ্বাস করা যায় না। কালজ্ঞাপক "সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক'ই ইহার প্রাচীনত্বের একমাত্র প্রমাণ এবং ইহা বাদ দিলে 'মনসা বিজয়ের' প্রাচীনত্বকে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা কঠিন।

এই কাব্যের প্রারম্ভে বিপ্রদাস যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, তিনি নাদুড়্যা বটগ্রামে (কোন কোন পুঁথিতে বাদুড়্যা) বাৎস্য গোত্রের পিপলাই শাখার (পৈপলাদ) সামবেদের অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কবিরা চারিভাই। পিতার নাম মুকুন্দ পন্ডিত।

বিপ্রদাসের মনসাবিজয়[৪১] সম্বন্ধে সম্পাদক ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য : " In the whole of middle Bengali Literature there is never a tale more sincerely and effectively told than Vipradas narrative."

কাব্যটি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে রচিত হইলে ইহা বিজয়গুপ্তের অপেক্ষা যে উৎকৃষ্টতর, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কাহিনীটির ঘটনা বিন্যাস স্বচ্ছ, ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন এবং বর্ণনা ভঙ্গিমা উৎকট আতিশয্য বর্জিত। অবশ্য কবির ভাষাভঙ্গীমা এতই পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত যে ইহার প্রাচীনত্বের সম্বন্ধে স্বতঃই সন্দেহ জাগে। যে কাব্য

অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়, যাহার বহু অনুলিপি হয় তাহাতে অর্বাচীন কালের শব্দ প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু বিপ্রদাসের কাব্য কোনদিনই বহুলভাবে প্রচারিত হয় নাই ; কারণ ইহার প্রাপ্ত পুঁথির সংখ্যা মনসামঙ্গলের অন্যান্য কবিদের তুলনায় অতিশয় অল্প। উপরন্তু প্রাপ্ত পুঁথিগুলি কবির জন্মস্থানের নিকটেই পাওয়া গিয়াছে। বিজয়গুপ্তের পুঁথির মধ্যে নানা গোলমাল থাকিলেও ১৮৩৭ সালে অনুলিখিত পুঁথিটির ভাষাতেও অনেকটা প্রাচীনতা আছে। কিন্তু বিপ্রদাসের পুঁথিতে সেইরূপ কোন প্রাচীনত্বের চিহ্ন নাই — যদিও চারিখানি পুঁথির মধ্যে তিনখানির অনুলিপির কাল বিজয়গুপ্তের ১৮৩৭ সালের পুঁথির অপেক্ষা প্রাচীনতর।

বিপ্রদাসের মনসাবিজয়ের মধ্যে হাসান হুসেনের পালাটি দীর্ঘতর এবং অন্যান্য মনসামঙ্গলের তুলনায় সুপরিকল্পিত ; মুসলমান সমাজ ও জীবনের এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ ও তথ্যবহ পরিচয় একমাত্র মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল ছাড়িয়া দিলে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ বলিলেই চলে। মনসার সঙ্গে বিরোধের ফলে বিষাতিয়া সর্পের দংশনে বড় মিঞার মৃত্যু হইলে বাড়ীর চাকর-নফরগণের মনোভাব চমৎকার ফুটিয়াছে।

মিঞা যবে মৌত হইল　　গোলামের মোষ পাইল
বিবি লইয়া চলাইতে চায়।

বিপ্রদাসের কাব্যে মনসা-চরিত্রে একটা অভিনব বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এই চরিত্রে করুণা ও স্নেহ-মমতা সঞ্চার বিপ্রদাসের অন্যতম প্রশংসনীয় কৃতিত্ব। হাসন ভক্তির বশে দেবী পূজা করিলেন —

হাসন এতেক যদি করিল স্তবন
মনসা বাধিত অতি হইলা তখন।
অধিক বাড়িল দয়া হাসন কিঙ্করে
ডাকিয়া বলেন মাতা অধিক সুস্বরে।

হাসনের ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া তিনি বলিলেন, "অনায়াসে বর মাগ যেই মনে লয়।" তখন হাসন বলিল, "তব পদে ভক্তি অতি রহে নিরন্তর।" বেহুলা-মনসা-চাঁদের পারস্পরিক চরিত বর্ণনায়ও মনসাকে করুণাময়ী করিয়া আঁকিবার চেষ্টা লক্ষণীয়। ইহাও কাহিনীর আধুনিকতার ইঙ্গিত করিতেছে। প্রথম দিকে রচিত মনসা-

মঙ্গলের মনসা চরিত্রের কঠোরতা পরবর্তী কালের কাব্যে কিরূপ করুণ ও কোমল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার প্রমাণ বিপ্রদাসের মনসা। নারায়ণদেবের কাব্যে আদিরসের উল্লাস আছে। আবার তাহার সঙ্গে বিশাল কাহিনী, দেবদ্রোহী মানব ও ক্রূর দেবীর জিঘাংসার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়ে' সেরূপ মহাকাব্যোচিত প্রসার ও গভীরতা লক্ষ করা যায় না। বেহুলার বেদনা, সনকার বিনাশ, চাঁদের দুর্গতি — এ সমস্তই সহজ সরলভাবে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু সাহিত্যিক বক্রতা বা চারুত্ব নাই বলিলেই চলে। "বিপ্রদাসের কাব্যের ভূমিকা-গুলি, দেব হোক বা মানুষ হোক, স্বভাবসঙ্গতভাবে চিত্রিত হইয়াছে।[৪২] চাঁদের চরিত্র মোটামুটি সঙ্গত। পুত্রের বিবাহে আনন্দিত চাঁদের বর্ণনা —

চাঁদো রাজা নাচে কান্ধে হেতালের বাড়ি
ঝলমল করে মুখে পাকা গোঁফ দাড়ি।

গতানুগতিক চিত্রের মধ্যে একটা বৈচিত্র্য সঞ্চার করিয়াছে। চাঁদের চরিত্র সম্পর্কে বলা যায় যে পুরাতন বাঙ্গলা সাহিত্যে চাঁদের মত পুরুষচরিত্র আর একটি নাই। যে-দেবতার কাছে মাথা বিকাইয়াছেন সে ছাড়া অন্য দেবতার কাছে নতি স্বীকার করিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। একথা কিন্তু বিপ্রদাসের চাঁদ সদাগর সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। কাব্যের শেষে চাঁদ মনসার নিকট মিনতি করিয়া বলিলেন, আমি পাপমুখে তোমার বহু নিন্দা করিয়াছি ; আমার মাথায় পদাঘাত কর, যাহাতে দোষ-নিন্দার যথোচিত শাস্তি হয়।

দেখিয়া চাঁদোর স্তুতি তুষ্ট বিষহরি
মাগিল জতেক বর দিলা পূর্ণ করি।
হাসি পদাঘাত কৈলা চাঁদোর মস্তকে
অন্তরিক্ষ হইয়া দেবী রহিল কৌতুকে।

মনসামঙ্গলের অন্যান্য কবিগণ দেবীকে দিয়া চাঁদোর মস্তকে পদাঘাত করান নাই। কাজেই অন্যান্য মনসামঙ্গল কাব্যের মতো এখানেও চাঁদের চরিত্রের শেষ রক্ষা হয় নাই। চরিত্র বর্ণনায় কবি খুবই সাদাসিধা কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য।

নারায়ণদেব

নারায়ণদেব মনসামঙ্গলের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ।[৪৩] তাঁহার আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা কঠিন । তবে হরিদত্তের পরেই কবি হিসাবে নারায়ণদেবের নাম করা যায় । তাঁহার গ্রন্থ প্রায় সমগ্র বাংলা ও আসামে প্রসার লাভ করে । জন্ম পরিচয় প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন —

> নারায়ণ দেবে কয় জন্ম মগধ ।
> মিশ্র পণ্ডিত নহে ভট্ট বিশারদ ॥
> অতি শুদ্ধ জন্ম মোর কায়স্থের ঘর ।
> মৌদগোল্য গোত্র মোর গাই গুণাকর ॥
> পিতামহ উদ্ধব নরসিংহ পিতা ।
> মাতামহ প্রভাকর রুক্মিণী মোর মাতা ॥
> পূর্ব পুরুষ মোর অতি শুদ্ধ মতি ।
> রাঢ় ত্যজিয়া মোর বোর গ্রামে বসতি ॥

রাঢ় হইতে আসিয়া নারায়ণদেব পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীনে তারাইল থানার অন্তর্গত বোরগ্রামে বসতি স্থাপন করেন । বোরগ্রাম পূর্বে নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত ছিল, ১৩০০ সালের পর হইতে কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত হইয়াছে । এই গ্রামে আজ পর্যন্ত "নারায়ণদেবের ভিটা" নামে একটি স্থান নির্দেশ করা হইয়াছে । তাঁহার বংশধরগণ এখনও পর্যন্ত এই গ্রামে বসবাস করিতেছেন । তাঁহারা নারায়ণদেব হইতে বর্তমান অষ্টাদশ পুরুষ । বর্তমানে তাঁহাদের কুলপদবী বিশ্বাস ও নস্কর । তাহাদের গৃহে নারায়ণদেবের একখানি পুঁথি রক্ষিত আছে । পুঁথিখানি প্রাচীন নহে তবে অন্ততঃ দুইশত বৎসর পূর্বে পুনর্লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় । নারায়ণদেবের বংশধরগণের গৃহে রক্ষিত বংশতালিকার একটি অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল । ইহা হইতে কবির সময় সম্বন্ধে একটি ধারণা করা যাইতে পারে ।[৪৪]

উদয় রাম
|
উদ্ধব রাম
|
নরসিংহ
|
১। নারায়ণদেব
|
২। চতুর্ভুজ
|
৩। অভিমন্যু
|
৪। চন্দ্রমন্যু
|
৫। অনন্ত রাম
|
৬। ভবদেব
|
৭। গৌরীপ্রসাদ
|
৮। নিমাই
|
৯। কৃষ্ণরাম
|
১০। রূপরাম
|
১১। মদনগোপাল
|
১২। নরোত্তম
|
১৩। কৃষ্ণচন্দ্র
|
১৪। শ্রীচন্দ্র
|
১৫। রামচন্দ্র
|
১৬। জগৎচন্দ্র
|
১৭। ভারতচন্দ্র

হরিপদ | সুবোধ | কালীপদ

আসাম অঞ্চলে নারায়ণদেবের বহুল প্রচারের জন্য অসমীয়াগণ নারায়ণ-দেবকে নিজ প্রদেশবাসী বলিয়া দাবী করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত নারায়ণদেবের পুঁথিকে প্রাচীন অসমীয়া ভাষার নিদর্শন রূপে গণ্য করা যাইতে পারে।[৪৫] অসমীয়াগণ সুকবি নারায়ণদেবের পুঁথিকে সপ্রেমে সুকনান্নী বলিয়া থাকেন। নারায়ণ-দেবের দাবী লইয়া অসমীয়া ও বাঙ্গালী উভয় পক্ষে কিছুকাল বাদানুবাদ চলিয়াছিল।[৪৬] বাঙ্গালীগণের মতে বোরগ্রাম মৈমনসিংহ জেলায়, অসমীয়াগণের মতে পূর্বে তাহা শ্রীহট্ট জেলায় অবস্থিত ছিল।[৪৭]

কতিপয় পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন নারায়ণদেব শ্রীহট্টের জলসুখা পরগণার নগর গ্রামে বাস করিতেন। তারপর সেখান হইতে ময়মনসিংহের বোরগ্রামে গমন করেন।[৪৮]

নারায়ণদেবের একটি উপাধিই ছিল সুকবি বল্লভ।[৪৯] অবশ্য সকলে ইহা সমর্থন করেন না।[৫০] বল্লভ ঘোষ নামে মনসামঙ্গলের একজন কবির উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫১] তিনি নিজেকে সুকবি বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন এবং মনসামঙ্গলের অনেক কবির ভণিতার সহিত নিজের নাম যোগ করিয়া দেন। তবে বল্লভ ঘোষের স্বাধীন ভণিতার পদও বিরল নহে।[৫২] কেবল কবি বল্লভই নহেন, নারায়ণদেবের সহিত মিশ্রভণিতাযুক্ত বহু কবির নাম পাওয়া যায়। যেমন "দ্বিজ যদুনাথ ভনে কহে দেব নারায়ণে" কবি রচে সরস পয়ার। ষষ্ঠী জন পেতে কহে নাচাড়ীর সার।[৫৩]

নারায়ণদেব স্বভাবকবি ছিলেন। তাঁহার রচনায় উচ্চাঙ্গ কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। করুণ রসের অবতারণায় নারায়ণদেব অনন্য ছিলেন। স্বামীকে জীবিত করিয়া বেহুলা প্রত্যাবর্তনকালে সামান্য সময়ের জন্য মাতা সুমিত্রার সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু পরিচয় প্রদান করেন নাই। সুমিত্রাও কন্যাকে চিনিতে পারেন নাই। আসলে বেহুলার স্বামীকে পুনর্জীবিত করিয়া প্রত্যাবর্তন রূপকের ন্যায়। নারায়ণদেব এই আলপনি সৃষ্টি করিয়া পাঠককে অশ্রুভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

নারায়ণদেব অন্যান্য কবির ন্যায় কাব্যের পরিসমাপ্তিতে চাঁদ সদাগরকে দিয়া ঘটা করিয়া মনসা পূজা না করাইয়া বাম হস্তে মুখ না ফিরাইয়া একটি ফুল দিয়া মনসা পূজা করাইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার রচনায় কাব্যগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নারায়ণদেবের রচনাকে অনেকে অশ্লীল বলিয়া থাকেন। তাহা হইলে প্রাক্-চৈতন্য সাহিত্যকেই অশ্লীল বলিতে হয়। এই অশ্লীলতার কারণ, সেই যুগে পুরাণগুলির নৈতিক হাওয়া দূষিত হইয়া উঠিয়াছিল। নারায়ণদেবের রচনার মুখ্য উপাদান ছিল সংস্কৃত পুরাণ। ইহা ছাড়া পতনোন্মুখ বৌদ্ধধর্মের অধঃপতিত নৈতিক আদর্শও ইহার মূলে কাজ করিয়াছিল।

কবি ক্ষেমানন্দ তাঁহার মনসামঙ্গল রচনার প্রারম্ভে বাণী বন্দনায় ব্যাস বাল্মীকির সহিত সশ্রদ্ধ চিত্তে নারায়ণদেবের নামও উল্লেখ করেন।

ব্যাস বাল্মীকি মুনি নারায়ণ তত্ত্ব জ্ঞান
তোমাকে সেবিয়া হইল কবি।

কবি জীবন মৈত্রের রচনার কোন কোন অংশের সহিত নারায়ণদেবের রচনার যেন এক দূর সাদৃশ্য আছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।[৫৪]

(৩) আসামে মনসামঙ্গল রচনার ইতিহাস ও কবিগোষ্ঠী

সমগ্র আসামের মধ্যে মনসা পূজা কেবল কামরূপ, গোয়ালপাড়া এবং মঙ্গলদৈ অঞ্চলেই প্রচলিত; মধ্য এবং উপর (অসমীয়া ভাষায় উজনী) আসামে মনসাদেবীর পূজা প্রচলিত নাই। কেবল পূর্ববঙ্গ হইতে আগত বাঙ্গালীগণ, যাহারা উপর আসামে বসতি স্থাপন করিয়াছেন তাঁহারা মনসা পূজা করিয়া থাকেন। সম্ভবত: মনসাপূজা বঙ্গদেশ হইতে আসামের পশ্চিম অঞ্চলে প্রবেশ লাভ করে। সান্নিধ্যের ফলে আসামের পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের সম্বন্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। তার উপর বঙ্গদেশের উত্তর পূর্ব অঞ্চলেই মনসা পূজার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক হইতে কামরূপে মুসলমান আক্রমণ ক্রমাগত হইতে থাকে। বহু মুসলমান তখন হইতে এই অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। এইভাবে আক্রমণ ও আসা যাওয়ার ফলে বঙ্গদেশের প্রচলিত লৌকিক ধর্ম পদ্ধতিও আসামে প্রবেশ লাভ করে। কামরূপ মঙ্গলদৈ অঞ্চলে একটা জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে 'মারিয়া' উপজাতিগণ প্রথমে মনসাদেবীর পূজা কামরূপে প্রবর্তন করে। মনসা সম্বন্ধীয় পদ পুঁথিও উক্ত জনপ্রবাদ সমর্থন

করে। মনকরের পদ্মাপুরাণের জাগরণ গীতে দেবদেবী, ব্রতী ইত্যাদিকে জাগাইয়া তাহার সঙ্গে 'মারিয়া মারিয়ানীকেও' জাগাইয়াছেন। এইভাবে মঙ্গলদৈ অঞ্চলের প্রচলিত মনসাদেবীর গীতে মনসাকে কেমন করিয়া পূজা করিতে হয় তাহা এইভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

(দিহা) থাপনক বান্ধিবা, মণ্ডপ কয়াইবা, পূর্ণ ঘণ্টা বসাইবা আসনে,
চারিদেশে কদলিকার বারি   ওপরে চান্দোয়া টানি
চতুপার্শে আরিবা চোঁয়ার
আখৈ চিরা কল   দধি দুগ্ধ মধুফল
বহুবিধ দিবা উপহার ॥
আগে গণেশ পূজি   বিষ্ণু আদি দেব হরি
উতসর্গিবা বেদ মন্ত্র চায়া।
এক চিত্তে মন করি   অনেক ধারণ ধরি
সযেমে থাকিবা উপবাসে ॥[৫৫]

উপরোক্ত মতে পূজা করিলে —

তুষ্ট হয়া ব্রহ্মাণী   মারিয়াক বোলে বাণী
ধনজন বাঢ়িবো অপার।
তুষ্ট হৈয়া পদ্মাবতী   দেখা দিলা তার
থাপনত বান্ধিয়া মারিয়াক দিলা বর ॥[৫৬]

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত মনসা পূজার গীত পদ গাওয়া বেশির ভাগ ওঝাই ছিল মুসলমান। (আসামে মনসা গীত গাওয়া প্রধান গায়ককে ওঝা বলে) নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণের (অসমীয়া সংস্করণ) অন্তর্গত 'হাচান হুচেন' পালা মনসাপূজার প্রসারেও মুসলমানগণের অবদান সূচিত করে। তবে একথা নিশ্চিত যে মনসা পূজা উত্তর পূর্ব বঙ্গ হইতে আসিয়া কামরূপ, গোয়ালপাড়া অঞ্চলে স্থিতিলাভ করে এবং মুসলমানগণের এই পূজা প্রসারে যথেষ্ট হাত আছে বলিয়া মনে হয়। পূর্ববঙ্গেও মনসামঙ্গলের গীত মুসলমান ওঝাগণের মধ্যেই বেশি প্রচলিত ছিল।

মনসাদেবীকে শক্তি-রই এক অভিব্যক্তি বলিয়া ধরা হয়। শক্তি-পীঠ কামাখ্যায় তাই সহজে মনসা স্থান লাভ করে। এখনও কামাখ্যায় মনসাপূজা এবং মনকর ও দুর্গাবরের মনসাগীতির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়।

কামরূপে মনসাদেবী তাহার ক্ষমতার পরিধি বিস্তৃত করেন। মনসাদেবী কেবল সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া না থাকিয়া 'মারি মড়ক অপায় অমঙ্গল বিনাশিনী এবং পুত্র, ধন, ঐশ্বর্যদাত্রী দেবী'তে পরিণত হইয়াছেন। মনসাপূজা করিলে নির্ধনীর ধন হয়, অপুত্রের পুত্র লাভ হয়। তিনি অসন্তুষ্টা হইলে 'মারি-মড়ক, অপায়-অমঙ্গল' বৃদ্ধি পায়। মারি মড়কের অধিষ্ঠাত্রীদেবী বলিয়া বোধ হয় মনসাদেবীর কামরূপে অন্য নাম 'মারৈ' দেবী। 'মারক' বা 'মারিক' শব্দ হইতেই সম্ভবত 'মারৈ' শব্দ হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতে কলেরা বসন্ত আদি ভয়াবহ ও সংক্রামক ব্যাধির অধিষ্ঠাত্রী হইলেন 'মারম্মা' বা 'মারিআম্মা'।[৫৭] আসাম অঞ্চলে 'আইর নাম'-এ (আই অর্থে মাতা। এখানে আইর নামে অর্থাৎ বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম-গান বা কীর্তন করা বোঝায়।) উল্লেখ করা আইর সাত ভগিনীর ন্যায় মারিআম্মার সাতজন ভ্রাতা-ভগ্নী আছেন। তাঁহাদের হাঁস কবুতর আদি বলিদান করিয়া সন্তুষ্ট করা হয়। আসামে মনসাপূজায় হাঁস, কবুতর, ছাগল, মহিষ বলি দেওয়া হয়। সুতরাং মনসা যদি প্রকৃতই দক্ষিণ ভারতের দেবী হন তাহা হইলে মনসার সহিত মারিআম্মাও প্রবেশ করিবেন বলিয়া সন্দেহ হয়। ভারতীয় সংস্কৃতিতে দ্রাবিড়গণের অবদান বোধহয় সমধিক। বহু পণ্ডিত বলেন যে হিন্দুর ফুল জল দিয়া পূজা করার পদ্ধতিটি দ্রাবিড়ীয় অবদান। মারৈ দেবীর সহিত মারিআম্মার সম্বন্ধ থাকুক আর নাই থাকুক, নাম বিষয়ক সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য। বড়ো জাতিগণ নাগপূজাকে 'মারৈ' পূজা বলে।[৫৮] সুতরাং মারৈ নাম বড়ো জাতি হইতে লওয়া হইতে পারে। কামরূপ জেলার মনসাপূজার সহিত অন্য একটি রীতি প্রণিধানযোগ্য; তাহা হইল 'দেওধানী নৃত্য'। কছারী জাতিগণের মারৈ পূজায় দেওধানী উঠা একটা অপরিহার্য অঙ্গ। বঙ্গদেশের মনসা-পূজায় দেওধনী উঠা পদ্ধতিটি নাই। কোন পর্ব বা উৎসবে পূজারীর গায়ে 'গোসানী' ভর করেন। তখন সেই মানুষ বলির পশুর তাজা রক্ত পান করেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেন। এই প্রথা আদিম সমাজের বহু স্থানে পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ কছারী জাতি হইতেই এই দেওধনী প্রথা হিন্দু সমাজের মনসা পূজায় পাওয়া 'ওজাপালির'

ভিতরে প্রবেশ লাভ করে। দেওধনী নৃত্যের কোন নয় নাই। 'দেওধনী' উন্মুক্ত দীর্ঘকেশে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উন্মত্তবৎ নৃত্য করে। দক্ষিণ ভারতের কানাড়া অঞ্চলে সর্পদেবতার উৎসবে এইপ্রকার দেওধনী উঠিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করা প্রথা বর্তমানেও আছে।[৫১] বোধ হয় এই দেওধনী প্রথা মনসাপূজায় প্রবেশ লাভ করে। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে কামরূপ জেলার মনসা চরিত্রের দুইটি দিক রহিয়াছে। একদিকে তিনি সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অন্যদিকে 'মারিমরকের' দেবী। মনসা চরিত্রের দ্বিতীয় অভিব্যক্তির সহিত দেওধনীর সম্বন্ধ। সুতরাং 'দেওধনী' মারেদেবীর উৎসব বা পূজার অঙ্গ বা অংশ। বহু আদিম জাতির মধ্যে 'মারি-মরক উপশম করিবার জন্য অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে এইরূপ দেওধনী উঠার বহুল প্রচলন আছে। দেওধাই বা দেওধনী উঠা প্রথা 'মারি মরক' ব্যাধি সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান বা অনুষ্ঠানের সহিত জড়িত। এখানে একটি কথা স্মরণযোগ্য যে শাস্ত্রীয় মনসাপূজার বিধির সহিত দেওধনী বা ওজাপালির কোন সম্পর্ক নাই। এই দুইটি মনসাপূজার বহিরঙ্গ প্রথা। আসামে চৈত্র মাস হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ষার কয়েকমাস পর্যন্ত মনসাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষত: শ্রাবণ মাসই ইহার নিমিত্তে প্রশস্ত।

মনসা পূজায় দেবীর কীর্ত্তি কাহিনী এবং প্রশস্তি বচনযুক্ত পয়ার পাঁচালী কীর্তন করা একটা প্রধান অঙ্গ। মনসা অর্বাচীন লৌকিক দেবতা, সুতরাং দুই একখানি অপেক্ষিক আধুনিক পুরাণে মনসাদেবীর উল্লেখ বা সামান্য বর্ণনা থাকিলেও বিশদ কীর্ত্তি কাহিনী সংস্কৃত সাহিত্য (পুরাণ) সমূহে পাওয়া যায় না। মনসাদেবী হিন্দুর দেবতার সারিতে উঠেন সবার পরে। এই সময়ে প্রাদেশিক ভাষাসমূহ ধীরে ধীরে সংস্কৃতির আশ্রয় গ্রহণ করার উপক্রম করে। সুতরাং মনসাদেবীর বিশদ কীর্ত্তিকাহিনী প্রাদেশিক ভাষায় রচনা হওয়ার কারণ হইল দেবীর লৌকিকতা ও অর্বাচীনতা।

অসমীয়া 'প্রাক শঙ্করী' যুগের বা শঙ্করদেবের সমসাময়িক লৌকিক সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এই কথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে এই সাহিত্য প্রধানত: গীতিমূলক। মনসা কাব্যগুলির সহিত 'পীতাম্বর দ্বিজের 'উষা পরিণয়' এবং দুর্গাবরের 'গীতিরামায়ণ' এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত কাব্যদুইখানির আখ্যান পৌরাণিক হইলেও রচনাভঙ্গী সম্পূর্ণ লৌকিক এবং সবখানিই 'ওজাপালির' যোগে গীত হয়।

প্রত্যেকখানি কাব্যই রাগরাগিনীযুক্ত গীত ও পদের সংমিশ্রণ । মহাপুরুষ শঙ্করদেবও একদিকে যেইরূপ নানা ধরনের নূতন গীতের প্রচলন করেন অন্যদিকে আবার ভাওনার সৃষ্টি করিয়া জনসমাজকে অভিনয়ের স্বাদ প্রদান করেন । কিন্তু 'প্রাকশঙ্করী' যুগে তদ্রূপ অভিনয়ের প্রচলন থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় না । ওজাপালির নৃত্যভঙ্গিমা, গীতের মাধুর্য এবং ওজাপালির সহিত হওয়া সংলাপনের অনেক পরিমাণে অভিনয়ের উদ্দেশ্যসাধন করিয়াছেন । অন্যদিকে নৃত্যগীতে দেবীকে সন্তুষ্ট করাও একটা উদ্দেশ্য ছিল ।

মনসাদেবীর পুণ-পরিমা কীর্ত্তি কাহিনী শ্রবণ কীর্তন এবং অভিনয় সদৃশ নৃত্য দর্শন করিলে ভক্তসকলের মঙ্গল হয় বলিয়া অসমীয়া মানুষের বিশ্বাস । বঙ্গদেশে এই জন্য এই শ্রেণীর কাব্যের নাম মঙ্গলকাব্য । মনকর এবং দুর্গাবরের কাব্যদুইখানিও মঙ্গলকাব্য শ্রেণীর । যদিও নৃত্যগীতযুক্ত কাব্যের অর্থে মঙ্গল শব্দটির ব্যবহার আসামে নাই । এই নৃত্যগীতের সমন্বয় ঘটা সর্বপ্রথম কাব্য জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' । সম্ভবতঃ জয়দেবের গীতগোবিন্দের আদর্শেই দেশীয় ভাষাসমূহে এ ধরণের নৃত্যযুক্ত কাব্য বিকাশ লাভ করে ।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে সমগ্র আসামের মধ্যে গোয়ালপাড়া, কামরূপ এবং দরং জেলায় কেবল মনসা পূজা হয় । তবে মনসা এখানে কোথাও মনসা নামে পূজিতা নহেন । উত্তরবঙ্গের ন্যায় এই তিন জেলায় মনসা 'বিষহরী' নামে পরিচিতা । বিষজ্বালার হাত হইতে মানুষকে তিনি রক্ষা করেন তাই ভক্তগণ তাঁহার নাম দিয়াছেন বিষহরী । দুর্গাবরের কাব্যের প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছে — "ওঁ বিষহর্য্যৈ নমঃ" ।[৬০] সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে মনসা বিষহরী নামেই সর্বজন বন্দিতা । আর সেই বিষহরীকেই মারৈ দেবী বলা হয় । যিনি মারৈ রূপে পরিচিতা তিনি বিষহরী রূপে পূজিতা । তাহারই অন্য নাম পদ্মকুমারী । বিষহরী পূজার সময় আসামে অনেক স্থানেই পদ্মকুমারী নামে পূজা করা হইয়া থাকে । এই পদ্মকুমারী দেবীর বীজমন্ত্র পং । মনকর তাঁহার মনসা কাব্যের প্রারম্ভে "ওঁ পদ্মকুমার্য্যৈ নমঃ" [৬১] বলিয়া কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন । পদ্মফুলে জন্ম হইয়াছে বলিয়া মনসার অপর নাম পদ্মকুমারী ।

মনসা দেবীর মূর্তি ও রূপের আলোচনা প্রসঙ্গে আসামে প্রচলিত পূজার ধ্যানমন্ত্র এবং অসমীয়া কাব্যে বর্ণিত মনসার রূপের আলোচনা প্রয়োজন। পুরোহিত এবং ভক্তগণের মন্ত্রে দেবীর রূপ মূর্ত হইয়া উঠে। আর কবি তাহার কাব্যে যে সাধারণ প্রাণের ভাষায় রূপ দান করেন তাহাতেও দেবী মূর্তিমতী হইয়া উঠেন। ধ্যানমন্ত্রে আছে –

(ক) ওঁ পদ্মাবতী মহাভাগাং সর্বদা ভক্তবৎসলাম্।
ত্রিলোচনাং চতুর্বাহু কিরীটি কুণ্ডলান্বিতাম ॥
দেবীং বিষহরীং গৌরাং নীল নাগ দধৎচেতাম।
তক্ষক অনন্ত বাসুকি মুকুট চন্দ্রশেখরাম্ ॥
কুলিকেন চ নাগেন সব্য শ্রবণ রাজিতাম।
তপ্ত কাঞ্চন বর্ণাভাং নাগযজ্ঞো পবীতিনীম্ ॥
শঙ্খপাল বরাভয়ঞ্চ দক্ষহস্তমহোজ্জ্বলাম্।
কম্বলেনাভয়েনৈব সব্যপাণী বিভূষিতাম্ ॥
ধূম্র বর্ণেন নাগেন কেয়ূর নবযৌবনাম।
স্বর্ণবর্ণেন নাগেন কঙ্কন সুপ্রতিষ্ঠিতাম ॥
কুন্দবর্ণেন নাগেন কটিসূত্র বিরাজিতাম্।
রক্তবস্ত্র পরিধানা পদ্মাসনা সমন্বিতাম ॥
চতুর্বাহু হংসেশ্চ বিমান বরগামিনীম্। [৬২]

দেবী পদ্মাবতী সতত ভক্তবৎসলা। তিনি ত্রিলোচনা, চতুর্বাহু এবং কিরীটি কুণ্ডল সমন্বিতা। দেবীর কুণ্ডলাগ্র নীল নাগ শোভিত। অনন্ত, তক্ষক, বাসুকি নাগগণ দেবী বিষহরী, গৌরীর মুকুটে চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কুলিক নাগ পূজ্যা দেবী তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা এবং নাগযজ্ঞোপবিত পরিহিতা। ধূম্রবর্ণের নাগ কেয়ূর এবং স্বর্ণবর্ণের নাগ হস্তে কঙ্কনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। রাজহংসবাহনা, রক্তবস্ত্র পরিহিতা, কটিসূত্রে রহিয়াছে কুন্দবর্ণের সর্প।

দেবী পদ্মাবতীর উপরোক্ত মন্ত্র ছাড়াও নিম্ন আসামে আর একটি মন্ত্র প্রচলিত । যেমন —

(খ) ওঁ দেবীং কিরীটি কুণ্ডল ধরাং শিরচন্দ্র বিভূষিতাম্ ।
জটাজুট সমাযুক্তা পীনোন্নত পয়োধরাম্ ॥
নয়নোৎপল পত্রাভাং পদ্মাং পদ্মকরাং শুভাম্ ।
নাগহারেন সংযুক্তাং ত্রিনেত্রাং বরদাং শিবাম্ ।
বালকদম্ব গৌরাভাং পদ্মাং পদ্মকরাং শুভাম্ ।
নানালঙ্কার সংযুক্তাং হংসারূঢ়াবরপ্রদাম্ ।
সুরেশের স্তূয়মানাং তৃং নাগমাতরমাম্বিকাম্ ॥ [৬৩]

দেবী কিরীটি কুণ্ডল এবং শিরচন্দ্র বিভূষিতা, জটাজুট সংযুক্তা, সুউচ্চ কুচযুগ সম্পন্না, নয়ন উৎপল পত্রের ন্যায়, মুখমণ্ডল শারদিন্দু সদৃশ । তাঁহার কণ্ঠে নাগহার । তিনি ত্রিনেত্রা, বরাভয় ও মঙ্গলদায়িনী । বালকদম্বের ন্যায় তাঁহার গাত্র বর্ণ, পদ্মধারিনী । নানালঙ্কার সংযুক্তা হংসারূঢ়া সেই নাগমাতা অম্বিকাকে দেবতা এবং অসুরগণ স্তুতি করেন ।

এতদ্ব্যতীত অসমীয়া মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত মনসার বর্ণনাগুলি অনুসরণ করিলে মনসামূর্ত্তি ও তাহার রূপ স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় । তবে অসমীয়া কবিগণের মধ্যে ষষ্ঠীবর দত্তের কাব্য দুষ্প্রাপ্য । কেবল মনকর, দুর্গাবর এবং নারায়ণদেবের কাব্যের মনসামূর্ত্তির আলোচনা করা হইল ।

(গ) নাগেসে আসন নাগেসে বসন নাগেসে শ্রীফল ধরে ।
যাহার ডরে ডরে ত্রিভুবন কান্দে নরে থাক বাদ করে ॥

সিঁথেতে সিন্দুর পায়ত নূপুর চলিতে রুনুঝুনু বাজে ।
অষ্ট অলঙ্কার কর্ণত কুণ্ডল কটিত কিঙ্কিনী বাজে ॥ [৬৪]

অপর একটি বর্ণনায় রহিয়াছে

(ঘ) হংসর পিঠিত রে উঠিয়া দুই পায় ।
স্বর্ণ হস্তে নামিলেক বিষহরী মায় ॥ [৬৪]

আসামের সর্বত্র এই মূর্তিতে পূজা করা হয়। আসামের নিম্ন অঞ্চলে বিশেষত গোয়ালপাড়া জেলায় সোনার তৈয়ারী 'মঞ্জুসায়' পূজা করা হয়।[৩৫] চতুষ্কোণ মন্দিরের ন্যায় সোনায় তৈয়ারী মঞ্জুসার একদিকে লাল রং দিয়া বিষহরীর মূর্তি অঙ্কন করা হয়। এই মঞ্জুসা|মাঞ্জুস উচ্চতায় প্রায় তিন ফুট হয়। তাহার উপরে সোনায় তৈয়ারী সর্পফণা দেওয়া হয়। আর তাহার পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতা বিশিষ্ট সোনা-নির্মিত বিষহরীর মাঞ্জুস থাকে। ইহাকে কানী বিষহরী বলে। ইহার সহিত উত্তরবঙ্গের শীদাল বিষহরী ও কাণী বিষহরী সাদৃশ্য আছে। বিষহরী মাঞ্জুস পূজায় কাণী বিষহরীর সহিত সোনা-নির্মিত ছয়টি পুতুল মাটিতে রাখা হয়; ইহাদের দুইটি গোধা এবং গোধানী, দুইটি চাঁদসদাগর এবং বিহুলা আর অপর দুইটি সোনাই ও মন্ত্রী রূপে ধরা হয়। ইহাদের নামে পূজা হয়না। বিষহরী পূজান্তে মাঞ্জুস নদীজলে বিসর্জন দেওয়া হয়।

বিষহরী পূজা সর্পভয় নিবারণের জন্যই নহে, ধন পুত্র লাভ করিবার নিমিত্ত সাধারণত এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। যে কোন পারিবারিক অনুষ্ঠানে মানুষ মনসাপূজা অবশ্য করণীয় বলিয়া মনে করে। সেই জন্য বৎসরের যেকোন সময়ে পূজার ব্যবস্থা রহিয়াছে তবে মনসা কাব্যগুলিতে বিশেষ পূজা-দিবসের উল্লেখ দেখিতে পাই।

— চৈত্র জে মাহর শুক্লা দ্বাদশী গোঞার জনম কায়। ১৩

আবার

চৌমাস বরিষা মাস রাত্রিদিনা মঙ্কেঃ নয়া পূজা পান। ১৪

ইহা হইল মনকরের বর্ণনা। তাহার পূর্বে দুর্গাবরও সেইরূপ সময়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার কাব্যে।

বরিষেক অন্তরে বারিষা সময়ত।
চারিদিন পূজিবেক শ্রাবণ মাহত॥
দুই সংক্রান্তির দুই পঞ্চমী পূজিবা
পদ্ম পাই সুপ্রসন্ন সুখত থাকিবা॥[৩৬]

সুকবি নারায়ণদেব তাঁহার 'সুকন্যানী পদ্মাবতী' কাব্যেও এইপ্রকার বর্ণনা দিয়াছেন। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে বর্ষাকালেই মনসা পূজিত হন। বর্ষাকালে সর্পভয় বেশি বলিয়া ইহা হওয়া স্বাভাবিক।

জন্ম মোর শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণ পঞ্চমী দিবসে
যেই পূজে সেই তিথি লইয়া
ধনে পুত্রে ঠাকুরাল সুখে থাকে চিরকাল
পূজা বিধি কৈল বুঝায়া ॥

অন্যত্র কবি বলিয়াছেন —

শ্রাবণ মাসত কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি পায়া
পদ্মার জন্ম তিথি তোরে দিল কৈয়া। [৬৭]

সুতরাং মনকর, দুর্গাবর ও নারায়ণদেব প্রত্যেক কবিই মনসার পূজার সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রত্যেকের উল্লেখিত পূজা তিথি একত্র করিলে নিম্নরূপ হয়।

ক) মনকর — ১) চৈত্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী
২) বর্ষার চারিমাস যে কোন রাত্রি

খ) দুর্গাবর — ১) শ্রাবণ মাসের যে কোন চারিদিন
২) শ্রাবণ ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি
৩) শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি

গ) নারায়ণদেব — ১) শ্রাবণের কৃষ্ণা পঞ্চমী

মনসা বা পদ্মা সর্পের দেবী। এই দেবী সর্পভয় নিবারণ ও সকল অমঙ্গল দূর করিয়া উপাসককে আয়ু, যশ, ধনগৌরব দান করে বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। সর্পদেবীর পূজা বিভিন্ন রূপে অনেক জাতির মধ্যে দেখা যায়। পূর্বভারত আর্য-সংস্কৃতিসম্পন্ন লোকের মধ্যে সর্পদেবী মনসা বা পদ্মাদেবী নামে পূজিত হয়। মনসার বিশেষণ ও শক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আর্য-অনার্য, বৈদিক-অবৈদিক হিন্দু বৌদ্ধ

জেন এই বিভিন্ন সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের সংমিশ্রণে মনসা দেবীর অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে বলিয়া ভাবা যায়। তিনি একাধারে হংসবাহিনী, বিষহরী, গৌরবর্ণা, নাগালঙ্কার ভূষিতা, ত্রিনেত্রা, ব্রহ্মাণী, আস্তিক মাতা, বাসুকি ভগিনী, শিবকন্যা, জরৎকারী, কাণী, তোতলা (ড: গোপীনাথ রাও এর Indian Iconography গ্রন্থে তোতলা দেবীর ধ্যান আছে।) এবং জাঙ্গুলী। বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন বিশেষণে বিভিন্ন প্রভাবের ইঙ্গিত বহন করে।

সংস্কৃত পুরাণে মনসা মাহাত্ম্য বিশেষ পাওয়া যায় না। ব্রহ্মবৈবর্ত আদি দুই একখানি অর্বাচীন পুরাণে সামান্য উল্লেখ আছে। মনসা মাহাত্ম্যসূচক সকল কাব্যই নব্য ভারতীয় ভাষায় বিশেষত বাংলা ও অসমীয়া ভাষায় রচিত। আসামের পশ্চিম অঞ্চল বঙ্গদেশ ও বিহারের অংশবিশেষে নাগপঞ্চমীতে মনসাপূজার প্রচলন দেখা যায়। আসামে মনসাপূজার প্রচলন কখন প্রচলিত হইয়াছে তাহা সঠিকভাবে বলা কঠিন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে নির্মিত হস্তীর উপর অধিষ্ঠিতা নাগেন্দ্র বাহিনী মনসার মূর্তি আসামের নুমলীগড় অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক হইতে বর্তমান রূপে মনসা পূজা প্রচলিত হয় বলিয়া মনে হয়।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পূজাপদ্ধতিতে মনসাদেবীর পূজা প্রচলন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনসার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক গীতপদ (পোতার পাচালী) ওজাপালীগণ গাহিতে আরম্ভ করে এবং ওজাপালী গাহিবার সময় দেওধানী বা দেওধা উঠিয়া নৃত্য করা ও ভাবমন্দ জ্ঞাপন করার রীতি প্রচলিত হয়। মনসাপূজা উপলক্ষে গীত পদগুলিকে প্রধানত দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়, মনসা বা পদ্মার জন্ম বৃত্তান্ত ও বেহুলা আখ্যান পদ্মার জন্মখন্ডে সৃষ্টি বর্ণনা, হরপার্বতীর বিবাহ, পদ্মার উৎপত্তি, চন্ডীর সহিত মনসার বিরোধ, মনসার দেবত্বলাভ ও পূজা প্রচলনের বিবরণ থাকে। দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ বেউলা আখ্যানে শিবভক্ত চান্দ বা চন্দ্রধর সাউধের সহিত মনসার বিরোধ, চান্দের মনসা পূজা করায় অস্বীকার, চন্দ্রধরের ছয় পুত্রের সর্পদংশনে মৃত্যু, চন্দ্রধরের বাণিজ্য নষ্ট, সপ্তম পুত্র লখীন্দরের জন্ম ও বেউলার সহিত বিবাহ, বিবাহের রাত্রিতে লখীন্দরের সর্পদংশনে মৃত্যু, স্বামীর মৃতদেহ লইয়া বেউলার নৌকা যাত্রা, নেতাই ধুবুনীর সাহায্যে বেউলার স্বর্গগমন এবং দেবসভায় নৃত্যগীতের দ্বারা মহাদেব, ইন্দ্র আদির সন্তুষ্টিবিধান, দেবতার বরে লখীন্দর আদি চন্দ্রধরের

সাতপুত্রের পুনর্জীবন লাভ ও বেহুলার অনুরোধে শেষে চন্দ্রধরের বাম হস্তে পদ্মা-পূজা প্রদান ইত্যাদি কথার বিবরণ পাওয়া যায় । সুকবি নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে উপরিউক্ত প্রধান ঘটনার বাহিরে বহু প্রাসঙ্গিক উপাখ্যান ও বর্ণনা পাওয়া যায় ।

মনসা-মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্য রচয়িতাগণের মধ্যে মনকর, দুর্গাবর ও সুকবি নারায়ণদেব বিশেষ প্রসিদ্ধ । দুর্গাবর ও মনকর সমসাময়িক কবি, সুকবি নারায়ণ তাঁহাদের দুইজন অপেক্ষা পরবর্তী কবি ।

কবি মনকর

কবি মনকর সম্পর্কে বর্তমান অসমীয়া সাহিত্যে বিস্তৃত খবর পাওয়া যায় না । তাঁহার রচিত কাব্য হইতে যৎসামান্য যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা এখানে বিধৃত করা হইল । কবি মনকর পদ্মাপুরাণ বা বেউলা-লখীন্দরের উপাখ্যান সম্বন্ধে একখানি গীতিকাব্য রচনা করিয়াছিলেন । বর্তমানে এই পুঁথি দুষ্প্রাপ্য । কবি তাঁহার পুঁথিতে এই ভাবে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন —

প্রথমে বন্দিয়া গাইবো নারায়ণ সুরপতি ।
ব্রহ্মা আদি দেব বন্দো আর সৃষ্টি স্থিতি ॥
ধর্ম কর্ম বন্দিয়া গাইবো গঙ্গাপার্বতী ।
তাতে পাছে বন্দিয়া গাইবো লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
কামরূপর কামাখ্যা বন্দো ঢেকেরি আর নাতি ।
পাতালক নাগবন্দো এ নাগ দেয়তি ॥
দুতি অপ্রায়তি বন্দো অশেপুরা লোক ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল বন্দো এ তিনি ত্রৈলোক ॥
ত্রিদস দেওতা বন্দো আনো দেবগণ ।
তাত পাছে বন্দিলো গাইবো দেব নারায়ণ ॥
আঠচল্লিশ দেওক বন্দো আরু বর দেবর ।
সর্বতীর্থ লৌহিত্য বন্দো সপতি সাগর ॥

কমতার রজা বন্দো রজা জল্পেশ্বর ।
একশত মহিষি বন্দো আঠার স কুমার ।।
পঞ্চদেওতাক বন্দো গুরুর দুই পাও ।
পদুমাই সুপ্রসন্নে মনকরে গাই ।।

ইহা হইতে জানা যায় যে জল্পেশ্বর নগর কমতা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল আর সেই নগরবাসীকে (জল্পেশ্বরীয়া লোক) কবি বন্দনা করিয়াছেন । কবি কমতা এবং কামরূপ দুইখানি রাজ্যের নাম করিয়াছেন । কামরূপের কামাখ্যার তখন খ্যাতি ছিল । কবি জল্পেশ্বরকে 'কমতাইর রজা' বলিয়াছেন । এই রাজার একশত মহিষী ও আঠার জন কুমার ছিল । কবি জল্পেশ্বরের লোক ছিলেন বলিয়া নি:সন্দেহে ধরিয়া নওয়া যায় । আসামের ইতিহাসে জল্পেশ্বর রাজা বর্তমান জলপাইগুড়ির সন্নিকটে 'জল্পেশ্বর' বা জল্পেশ নামে শিব মন্দির স্থাপিত করিয়া তাহার নিকটে রাজধানী স্থাপন করেন ।

এতদ্ব্যতীত কবি আরও দুই একখানি স্থানের নাম করিয়াছেন, তাহার মধ্যে চিক্না (পুকোনা) হাট প্রধান ।

দ্রঃ — হাট বেসাইবার চলে চলিল জে:
পেটত বান্ধে দারুণ লই আ:
দুর্গাক শয্যাত সুতাইয়া থৈয়া:
বেহাইতে গৈলা পুকোনার হাট ।

পুকোনা (চিকনা) প্রাচীন কালের একখানি বিখ্যাত স্থান । এই স্থান রত্নপীঠে অবস্থিত এবং গোয়ালপাড়া জেলার সিদলি ও বিদ্যাগ্রামের উত্তর পশ্চিমে চম্পমতী ও সোণকোষ নদীর মধ্যে অবস্থিত । সেই সময় তাহাতে হাট বসিত । তাহার পরবর্তী সময়ে বিশ্বসিংহের পিতা হরিদাস মণ্ডল (মতান্তরে হাড়িয়া মণ্ডল) তথায় নগর স্থাপন করেন । এই চিকনা নগরই হরিদাস মণ্ডলের রাজধানী ছিল । চিকনা নগর অবশ্য কোচবিহার নহে । চিকনানগর ধুবুরী হইতে ৫০।৬০ মাইল উত্তরে আবার কোচবিহার হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত ছিল । মনকরের পুঁথিতে কুনধারী নামক স্থানের কুচুনীপাড়ায় মহাদেবের ক্রীড়া করার কথা পাওয়া যায় । এই কুনধারী কোথায় অবস্থিত তাহা বলা শক্ত ।

জল্পেশ্বর রাজার সময় সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই। জল্পেশ্বর মন্দিরের ইতিবৃত্ত লেখকের মতে জল্পেশ্বর রাজা আনুমানিক ৮০০ খৃ: তিস্তা-নদীর পার্শ্বে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কাহার মতে জল্পেশ্বর ও জিতারি সমসাময়িক রাজা ছিলেন। জিতারি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে কামরূপে রাজত্ব করিতেন। জনশ্রুতি আছে যে খৃষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীর মধ্যে জিতারি নামে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী মধ্যকামরূপে রাজত্ব স্থাপন করেন। গেইটের মতে জিতারি বংশের অরিমত্ত খৃষ্টীয় ১২০৮ সালে কামরূপের রাজা ছিলেন।

কামরূপের ইতিহাস অনুসারে জল্পেশ্বর এবং পৃথু একজন রাজা। ড: বুকানন হেমিল্টনে অনুমান করে যে পৃথু রাজা আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর মানুষ। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে মহম্মদ বখতিয়ার মগধ অধিকার করেন এবং উক্ত বখতিয়ারের সহিত এই পৃথু রাজার ১২০৬ খৃ: সংঘর্ষ হয়। রায়বাহাদুর কে.এল. বরুয়া 'তবাকত ই নাচিরি' তে উল্লেখ করা বৃতুকে পৃথু এবং উক্ত বখতিয়ারকে সমসাময়িক বলিয়াছিলেন।

ইহা হইতে আমরা বলিতে পারি যে, বুকাননের মতে পৃথু, পাল এবং নীলাম্বর (সেন) – এই তিন বংশের রাজাই ক্রমানুয়ে কমতাপুরে রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় অর্থাৎ পাল বংশের একজন রাজা ১১৭৫ খৃষ্টাব্দে আসামের কামরূপে রাজত্ব করে (Vide -'Areport on Rangpur' by E.G.Glazier, PP 8-14). সুতরাং প্রথম বংশের পৃথু রাজা নিশ্চয় ১১৭৫ খৃ:পূর্বে বর্তমান ছিলেন। কবি নিজেকে "ঢেকেরিয়ার নাতি" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু এই ঢেকেরিয়া কে ? দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত মালদোয়ার ব্রাহ্মণ জমিদারের সেরেস্তায় রক্ষিত একখানি তাম্রপত্রে মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ নামে একজন সামন্ত রাজার নাম পাওয়া যায়। তিনি আনুমানিক দশম কি একাদশ শতাব্দীর মানুষ। সেই রাজা জটোদা (বরপদা-ধর, জলঢাকা বা মানহ) নদীতে স্নান করিয়া একজন ব্রাহ্মণকে "ঢেক্করী"র নিকট হইতে পিপোল্লা বিষয়ে এক খণ্ড ভূমিদানের কথা উক্ত তাম্রপত্রে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। বাবু বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম.এ., মহাশয়ও এই কথা স্বীকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে 'ঢেক্কেরীয়' বিষয়ের ঈশ্বর ঘোষ নামের একজন সামন্ত রাজার একখানি

অনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীর তাম্রপত্র পাওয়া গিয়াছে। ঈশ্বর ঘোষ "ঢেক্করীয়া" বংশের দ্বাদশ শতাব্দীর একজন সামন্ত রাজা। আবার সেই বংশের সিংহ উপাধিধারী আরও একজন রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে। তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর মানুষ ছিলেন। সুতরাং 'ঢেকেরিয়া' যে একটি রাজবংশ আর সেই বংশের রাজা যে তিন চারি শতাব্দী সেই অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। কবিও সেই বংশের একজন রাজপুত্র, ঢেকেরিয়া রাজার নাতি। তাঁহার কাল দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর ভিতর বলিয়া মনে হয়। মনে হয় হাড়িয়া মণ্ডল তখনও টিকনায় রাজা হন নাই। দুর্লভনারায়ণ তখনও কামতারাজ্যের অন্তর্গত 'গরিয়া' নগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন নাই এবং তাহার 'বেনেগীয়া' ভাই ধর্মপালও রাজা হন নাই।

মনকরের পদ্মাপুরাণকে গীতিকাব্য বলা যায়। প্রতি গীতের আদিতে একটি ধ্রুং বা ধুরা বা দিহা দেওয়া আছে। গীতের রাগ প্রায় পয়ার বা পাঁচালী। কবি স্বয়ং গুরুর নিকটে এই গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং মন্দিরা তান লইয়া ওজাপালী স্বরূপে সভা-উৎসবাদিতে গাহিয়াছিলেন। যেমন —

হাতেদি না জানো তান যে মন্দিরা
মুখে না জানোহো গীত
পয়ার পাঞ্চালী মইযে না জানো
আপুনি দিয়োক চিত।"

কবির ভাষা প্রাঞ্জল এবং অব সরল, "ধর ধর বিশ্বকর্মা আমোন মা," "তিরি লৈয়া গৃহ হাচিবার নহে যোগ" ইত্যাদি শব্দ গৃহস্থজীবনের অতি পরিচিত কথা। পুঁথিতে বর্ণিত বিবাহপদ্ধতি ও রীতিনীতি আজিও আসামে প্রচলিত আছে।

কবি শাক্ত ছিলেন। হরগৌরীর প্রভাব ও পদ্মার পূজা বিস্তৃত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তখনও কামরূপে যথেষ্ট পরিমাণে বৌদ্ধপ্রভাব ছিল। "ধর্ম কর্ম বন্দিয়া গাইবো গঙ্গা পার্বতী" – কথায় তিনি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্ম ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ড বন্দনা করিয়াছেন। "চায়া বৈলা দৈয় দৈয় বৌদ্ধরূপে

হুরা। চায়া রৈনা গোঁসাই জে বৌদ্ধরূপে হুরা" ইত্যাদি কথায় কবি বৌদ্ধধর্মাবলম্বীগণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন। আবার শূন্যপুরাণের ধর্মপূজা বৌদ্ধধর্মের শেষ বলা হইয়াছে। তাহাতে রামাই পণ্ডিতের বর্ণনা করা সৃষ্টি পাতনির কল্পনা (অসমীয়া সংস্করণ) মনকরের সৃষ্টিপাতনির সহিত মিলিয়া যায়। নিম্নে উভয় সৃষ্টি পাতনির উল্লেখ করা হইল।

নহিরেক নহি রূপ নহি ছিল বর্ণ চিন।
রবি শশী নাহি ছিল নহি রাতি দিন॥
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাশ।
মেরু মন্দর না ছিল না ছিল কৈলাশ॥
নহি ছিল ছিষ্টি আর না ছিল চলাচল।
দেহার দেউল নাহি পরবত সকল॥
দেবতা দেহরা ন ছিল পূজিবাক দেহ।
মহাশূন্য মধ্যে পরভুর আর আছে কেহ॥
রিসি জে তপসী নহি নহকি বাম্ভন।
পাহার পরবত নহি নহিক থাবর জঙ্গম॥
পুণ্যথল নহি ছিল নহি গঙ্গাজল।
সাগর সঙ্গম নহি দেবতা সকল॥
নহি ছিষ্টি ছিল আর নহি সুরনর।
বম্ভা বিষ্টু ন ছিল ন ছিল আঁবর॥
বার বরত নহি ছিল রিসি জে তপসী।
তীর্থ থল নহি ছিল গঙ্গা বরানসী॥
পৈরাগ মাধব নহি কি করিব বিচার।
সরগ মরত নহি ছিল সভি ধুন্ধুকার॥
দস দিকপাল নহি মেঘ তরাগণ।
আউ মিত্যু নহি ছিল জমের তাড়ন॥
চারি বেদ নহি ছিল শাস্ত্র বিচার।
গুপুত বেদ করিলন্ত পরভু করতার॥

জীয় জন্ত নহি ছিল ন ছিল বিম্ব পাত ।
দেব থল নহি ছিল ন ছিল জগন্নাথ ॥
সুন্যত ভরমন পরভুর জনমিল পবন ।
তাহা হইতে জনমিল অনিল দুই জন ॥
অনিল হতে পরভুর হও গেল দয়া ।
ঠাকুরের পরিসদ হইল কত মায়া ॥
আসন ছরিয়া পরভু বৈসেন চুমুক উপরে ।
পরভুর আসন বিম্ব সহিতে না পারে ॥
ভাঙ্গিল জলের বিম্ব হইল ভাগ ভাগ ।
সুন্যেতে বেড়াজন পরভু কাউর নাহি পান লাগ ॥
সুন্যেতে বেড়াজেন পরভু নাগাল না পাইয়া ।
তথা হইতে রহিলেন্ত আসন করিয়া ॥
বিসার উপরে পরভু উপজিল দয়া ।
আপনি সিরজিল পরভু আপনার কায়া ॥
দয়ার সাগর পরভু হও গেল স্থিত ।
দেহ হইতে পুরুষ জন্মে আচম্বিত ॥
জনমিল পুরুস তার নাহিক হাত পাও ।
রক্ত বীজে জনম তার নাহিক বাপ মাও ॥
জনমিল পুরুস তার নাহিক দুটি আখি ।
আপনার কলেবর আপুনি সে দেখি ॥
দেহেত জনমিল পরভুর নাম নিরঞ্জন ।
পরভু সঙ্গতি কেহ নহ একজন ॥
শ্রীধর্ম চরণারবিন্দে করিয়া পনতি ।
শ্রীযুত রামাই কহে সুনরে ভারতী ॥ — শুণ্যপুরাণ

আবার —

নাহি জল নাহি থল নাহিকে আকাস ।
এ মেরু মন্দর নাহি নাহিকে কৈলাস ॥
নাহি ধর্ম নাহি কর্ম নাহি বসুমতী ।

গঙ্গা দুর্গা নাহি গোসাঁই লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
নাহি উদয়গিরি গোসাঁই নাহি অস্তগিরি ।
বাসুকি জে নাগ নাহি দ্বারকা জে পুরী ॥
দিবা রাত্রি নাহি গোসাঁই নাহি অন্ধকার ।
তিথি জে নক্ষত্র নাহি নাহি দিনবার ॥
নাহি রিদ্ধি নাহি সিদ্ধি এ যোগ ধিআন ।
অষ্ট বসু নাহি গোসাঁই আগম পুরাণ ॥
নাহি যতি নাহি সতি নাহি ক্রিয়াধারী ।
রিসি যে তপস্বী নাহি নাহি ব্রহ্মচারী ॥
নাহি জমরাজা গোসাঁই নাহি জমালয় ।
গো জে মনুষ্য নাহি উৎপত্তি প্রলয় ॥
স্বর্গ মর্ত নাহি নাহিকে পাতাল ।
শূনরূপে দেবের দেব ভাসে কতকাল ॥
শূন রূপে রৈলা বট পত্রের উপর ।
হাতভরি নাহি গোসাঁই আছে তিনপুর ॥
সৃষ্টি পাতিবাক গোসাঁই করিলা জুগুতি ।
মনকরে রচিলেক সৃষ্টির উৎপত্তি ॥ — মনকর : পদ্মাপুরাণ ।

আবার —

ধুয়া — ধি আনে বসিলা গোসাঁই ধিআনে বসিলা
রাম চরণ ফুটি গোসাঁই উপজিলা ॥ — মনকর

স্তুঃ — আকি, গোসাঁই অনাদি সৃষ্টি পাতে, মোর গোসাঁই ।
আপুনি পুরুষ ভৈলা আপুনি নারিগণ ।
গঙ্গা দুর্গা সৃজিল গোসাঁই আপুনি পরান । — মনকর

বড়ো জাতি সকলের প্রভাবও মনকরের মধ্যে দেখা যায় । যেমন —

মাটির ভারি সিন্দুর ডানি
পূজে বরিষার কারণে । — মনকর ।

অসমীয়া সমাজে তখন বৈষ্ণব ধর্মের সূত্রপাত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। "বিষ্ণু বিষ্ণু স্মরি দবে ভৈলা অন্তর্ধান, বৃন্দাবন জলে কিবা দিন রাতি", "দ্বারকা পুরি" ইত্যাদি কথা হইতে এরূপ অনুমান করা যায়।

মনকরের কাব্যকে তিনভাগে ভাগ করা যায়; সৃষ্টি খণ্ড, হরগৌরীর বিবাহ খণ্ড এবং বেহুলার জন্ম খণ্ড। তিন খণ্ডেই অতুলনীয় রচনাশক্তির পরিচয় বিদ্যমান। তবে কাব্য তাহাতে শেষ হয় নাই; তাহার পরবর্তী অংশ দুর্গাবর যেন রচনা আরম্ভ করিয়া শেষ করিয়াছেন। সৃষ্টিপাতন অংশে দেখা যায় বটপত্রোপরি অনাদিদেব ভাসিতেছেন। তারপর একে একে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, জীব ইত্যাদি সৃষ্টি হইল। পক্ষিনীর ডিম্ব হইতে বিশ্ব সৃষ্টির কথাও কাব্যে উল্লিখিত হইয়াছে। তার পরবর্তী অংশে কাব্যের মধ্যে পদ্মার জন্ম, তিথি, পদ্মার পূজার বর্ণনা ইত্যাদি অনবদ্য হইয়াছে।

জাহার বাপ ঈশ্বর শঙ্কর তিনি জগতে যে জানি।
হাতে শঙ্খ দণ্ড লৈয়া যে উঠিল বহুডাজয় বাহ্যুণি ।।
চৈত্র জে মাহর শুক্লা দ্বাদশী পৈচংার জনমকায়।
থায় নাই তার বাপ কেউনিয়া অজোনিকা জনমকায় ।।
বাসুকি যে নাগে সাত পাতাল ছেদিলা অষ্ট নাগে করে মান।
চৌমাস বরিষা মাস রাত্রি দিনা মন্ত্রে নয়া পূজা পান ।।
নাগেসে আসন নাগেসে বসন, নাগেসে শ্রীফল ধরে।
জাহাক ডরে ডরে ত্রিভুবন কাম্পে নরে জাক বাধ করে ।। (পৃ ১)

অন্য এক স্থানে দেবীর আগমনের দৃশ্যটি সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

হরে গো মইরে উপরে আলিপন।
প্রদীপ জ্বালিয়া করিয়া স্থাপন ।।
হংসর পিঠিত রে তুলিয়া দুই পায়।
স্বর্গ হন্তে নামিলেক বিষহরী মায় ।।

সমস্ত কাব্যেই নানা রূপ বর্ণনা রহিয়াছে। দুর্গা শিবের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য পুষ্পবনে যাত্রা অংশের বর্ণনা অতি অনুপম হইয়াছে।

দেরি করিলন্ত নান যেন চন্দ্র পরোকাস
দেহা কোটী সুরুজ বরণ
মনে দেখি মানমিন তাতে পিংহ উপজিন
সিংহ হৈল ততি রূপ মান । — (পৃ ২৬)

মনকরের কাব্যের সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে শূণ্যপুরাণের সাদৃশ্যের কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । এই সৃষ্টি তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য করিলে শিবের প্রাধান্য বিশেষভাবে দেখা যায় । "হরর আদেশে ব্রহ্মা সৃজিলা সকল" এই বাক্যের দ্বারা শিবের শ্রেষ্ঠতা দেখান হইয়াছে । অন্য এক স্থানে "অর্দ্ধঅঙ্গ মহাদেব অর্দ্ধঅঙ্গ ধর্ম" বাক্যে ধর্মদেবতা এবং মহাদেবকে এক বলা হইয়াছে । ধর্ম সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করা পণ্ডিতগণের মতে সৃষ্টি তত্ত্ব তান্ত্রিক বজ্রযান ও শৈব নাথ সম্প্রদায়ের ধর্মমতের একত্র সংমিশ্রণে উদ্ভব হইয়াছে । অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' আদি দুই একখানি পুরাণে এই রূপ সৃষ্টিতত্ত্ব প্রবেশ লাভ করিয়াছে । মনকরের কাব্যই ধর্ম ও শৈব নাথ ধর্মের একটি লুপ্তপ্রায় স্তর নির্দেশ করিয়াছে ।

মনকরের কাব্যে লৌকিক ও সামাজিক বর্ণনার প্রাধান্য দেখা যায় । বিশ্বকর্মার কামারশাল, হেমন্ত ঋষির পত্নীর পুকোণায় হাট বসান, নারদের চাতুরালী, হরপার্বতীর কামকেলি, কুচুনীবেশে দুর্গা, মহাদেবের সঙ্গে গঙ্গার তর্ক বিতর্ক, দুর্গার সতীত্ব পরীক্ষা ইত্যাদি বর্ণনায় তৎসময়ীয়া সামাজিক জীবনের জীবন্ত চিত্র প্রকাশ পাইয়াছে । লৌকিকতার প্রাধান্যের জন্য কাব্যে বর্ণনার গাম্ভীর্য লোপ পাইয়াছে । চরিত্রগুলি দেবতা হইলেও কার্য্যত সাধারণ মানুষ । মনকরের মহাদেব পৌরাণিক শান্ত সমাহিত কামদেব ভস্মকারী শিব নয় লৌকিক কৃষক দেবতা রূপেই মহাদেবের প্রকাশ । হরপার্বতীর বিবাহ অংশের প্রত্যেকটি বর্ণনাই তৎসময়ীয়া সমাজের হুবহু চিত্র বলিয়া মনে হয় । দুই এক স্থানে অশ্লীলতার চূড়ান্ত চিত্রও দেখা যায় । প্রাচীন কাব্যগুলিতে অশ্লীল ও গ্রাম্য-ভাবের মধ্যদিয়া হাস্যরসের অবতারণা করার প্রচেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় ।

মনকরের কাব্য কৃত্রিম দিব্য উপবন নয়, প্রকৃতির নিজে গড়া কানন, মধ্যে মধ্যে উলুবন কাদা খোঁচাও আছে । মনকরের স্বাভাবিক বর্ণনা ও অলঙ্কারের নিদর্শন নিম্নে দেওয়া হইল ।

১) গগন সমান নদীখান ছোট ।
খরতর ভুজঙ্গর ছিন্দে নাঙ্গ পোট ।।

২) কমল মুখর মুচকিয়া হাসি ।
শরীর শোভে কেতেকীর পাখি ।।

৩) অমূল্য কুসুম বস্ত্র পিন্ধিলা গোঁসানী ।
শরীর জ্যোতি জ্বলে ত্রিভুবন জিনি ।।

৪) বত্রিশ অলঙ্কার পিন্ধি বাপের তৈল ভোগ ।
হেমন্তর মনে বর মুগাইলা বাঘ ।।

৫) বায়ুবেগে দেরীয়ে নদীরে হৈলা পার ।
জাঙ্গালী দেখায় পূজা মোচরিব ঘার ।।

মনকরের ভাষায় মনে করিবার মত দুই একটি বৈয়াকরণিক বিশেষত্ব আছে। রূপবাণের স্থলে রূপমান, ক্রিয়াপদে ও বা ব - র স্থলে য় - এর ব্যবহার লক্ষণীয় ।

মনকরের কাব্যে পদ্মার জন্ম পর্যন্ত পাওয়া যায় । মর্ত্যে পদ্মাদেবীর পূজা প্রচার, চন্দ্রধর সাউধের সঙ্গে বিরোধ, বেহুলা আখ্যান মনকরের কাব্যে পাওয়া যায় না । মনকর যে বেহুলা আখ্যান লিখিতে মনস্থ করেন বা লেখেন নাই যদিও কিন্তু সেই আখ্যানের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল । সেই কথা সৃষ্টিখণ্ডের শেষে — "কাণ্ডের মেরত পরি ডংকিব লখাই" এই পদ হইতেই অনুমান হয় যে তিনি বেহুলা আখ্যান লিখিয়াছিলেন কিন্তু তাহা নষ্ট হইয়াছে ।

কবি দুর্গাবর

মনসাকাব্যের মনকরের পরবর্তী অংশ দুর্গাবর রচনা করেন বলিয়া মনে হয় । মনকর সৃষ্টিখণ্ড, হরপার্বতীর বিবাহখণ্ড এবং বেহুলার জন্মখণ্ড পর্যন্ত লিখিয়া তাহার কাব্য সমাপ্ত করিয়াছেন ; তাহার পর হইতে শেষ পর্যন্ত রচনা করেন কবি দুর্গাবর । যেন দুই কবি যুক্তি করিয়া কাব্য রচনা আরম্ভ করেন । তবে মনসা কবিগণের মধ্যে কবি দুর্গাবর উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্বরূপ ।

তাঁহার সম্পর্কে বিষয় চন্দ্র বিশ্বাসী বলিয়াছেন — "এওঁর জীবনী সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান করি আজিলৈ আমি এইখিনি মাথোন জানিব পারিছো যে কামরূপ জেলার হাজো মৌজার কোনো এখনি সরু গাঁওত কায়স্থ কুলত তেওঁর জন্ম হৈছিল।[৬৮] বিশ্বাসীর এই উক্তির সম্পূর্ণ যথার্থতা বর্তমানে পাওয়া যায় না। দুর্গাবরের রচনা পদ্মার পাঁচালীতে তাঁহার পরিচয়ের কয়েকটি ক্ষীণ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একস্থানে আছে —

শ্রী কায়স্থ চন্দ্রধর তার পুত্র দুর্গাবর
বিরচিন গীত বিতোপন।

ইহা হইতে জানা যায় দুর্গাবর কায়স্থ কুলোদ্ভব আর তাঁহার পিতার নাম ছিল চন্দ্রধর। কবি দুর্গাবর আর একজন মানুষের নাম তাহার পদ্মার পাঁচালীতে উল্লেখ করিয়াছেন আর তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়াছেন।

কটোয়াল বাহুবল কুলর কমল। কবি দুর্গাবর-কৃত কথা সুকোমল ॥
পন্ধত পুষ্পত যেন মালতী সুবাস। বংশর মধ্যত বাহুবলর প্রকাশ ॥
প্রতি দেও বরে পুত্র পাইলেক প্রধান। কবি দুর্গাবরে গীত করিলা বাখান ॥
বাহুবল শিকদার যে গোজা সম্প্রসন্নে। চিরঞ্জীবী হৌক কবি দুর্গাবর ভণে ॥

দেবী যে দিলন্ত বর সুতবর সুন্দর
সর্বগুণান্বিত বাহুবল।
বৈরীগণ হবে বশ সুললিতবররস
দুর্গাবর কৃত সুকোমল।

এই বাহুবল শিকদার কবির পৃষ্ঠপোষক অথবা অনুপ্রেরণাদাতা। অন্য একস্থানে দুর্গাবর "বাহুবল শিকদার গন্ধর্ব অবতার" বলিয়া বাহুবলের সঙ্গীত-পটুতার ইঙ্গিত দিয়াছেন, অন্য একস্থানে আবার "পদ্মা দেউকর" বা মনসাদেবীর উপাসক বলা হইয়াছে। দুর্গাবর তাঁহার "আয়ু যশ বৃদ্ধি হৌক চন্দ্র দিবাকর' এবং উপরি উদ্ধৃত অংশে মঙ্গলকামনা করার কথা মনে করিবার মত। বাহুবল শিকদারের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। সম্ভবত তিনি শেষ বয়সে পাত্র পদবী লাভ করেন এবং নরনারায়ণ রাজার সময় ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে বীর চিলারায়ের আসাম অভিযানে ভীমবল

পাত্রের সহিত বাহাদুর রাজার সৈন্য লইয়া যুদ্ধযাত্রা করেন। সুতরাং দুর্গাবর কায়স্থ নরনারায়ণ রাজার সময়ের মানুষ বলিয়া পরোক্ষভাবে অনুমান করা যায় । আবার আত্মপরিচয় দানকালে কবি লিখিয়াছেন —

কমতা-ঈশ্বর বন্দো বিশ্বসিংহ নৃপবর ।
আঠচল্লিশ মহিষী বন্দো আঠার কোঁয়র ।।

ইহা হইতে বলিতে পারা যায় দুর্গাবরের পদ্মার পাঁচালী রাজা বিশ্বসিংহের রাজত্ব কালে রচিত না হইলেও তাহার রাজত্বের শেষভাগে কাব্যরচনা আরম্ভ করেন । রাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে রচিত হইলেও পুঁথিখানিতে বিশ্বসিংহের এইরূপ বর্ণনা থাকিতে পারে । কিন্তু নরনারায়ণের নামের উল্লেখ না থাকাটাই আশ্চর্যের কথা । অবশ্য একথা ভুলিলে চলিবে না যে, বর্তমানকাল পর্যন্ত দুর্গাবরী মনসা-গীতের পুঁথি খন্ডিত ভাবেই পাওয়া গিয়াছে । যাহা হউক দুর্গাবরকে বিশ্ব সিংহ ও নরনারায়ণের রাজত্বকালের কবি বলিয়া ধরিলে প্রমাদের সম্ভাবনা থাকে না । এডওয়ার্ড গেইটের মতে বিশ্বসিংহের শাসনকাল ১৫১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত । এই দিক হইতে দুর্গাবরকে প্রাক-শঙ্করী (শঙ্করদেব — আসামবাসীর বৈষ্ণব ধর্মগুরু) কবি বলার অর্থ থাকে না । ১৫১৫ সালেই শঙ্করদেবের বয়স ৬৬ বৎসর । অন্যদিকে দুর্গাবরের উপর শঙ্করদেব ও ভক্তি আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ্য করিলে এই যুক্তি অবান্তর বলিয়া মনে হয় । বরঞ্চ দুর্গাবর শঙ্করদেব অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন ।

দুর্গাবরের মনসাগীত বিরল এবং যাহা পাওয়া যায় তাহা প্রাচীনপন্থী

হাতত চন্দন বেত পালত গোট ধরি ।
নামিলা উত্তর হন্তে ওঝা ধন্বন্তরী ।।
সনেকার বাক্য শুনি বান্দিচয় বহু ।
দীপ আনি চাইবাক গৈলা লহু লহু ।।
লজ্জ নাহি মুখত আমাক বোলা চেডি ।
খুকু বাহু কিমত তুলিয়া দিবো ধরি ।।
বেহুলাই বোলে ভার্যা করিম বুকত ।
অস্থেরা ডামক দেখোঁ তোর শরীরত ।। (পৃ ৬৫)

দুর্গাবরের চন্দ্রধর সাউধ চম্পাবনী নগরে বাস করিতেন। চম্পাবনী নগরের বর্ণনা দিয়া দুর্গাবর তাঁহার কাব্য আরম্ভ করেন। কবির বর্ণনা কৌশল অপূর্ব।

পশ্চিমত বহে গঙ্গা গহীন গম্ভীর।
অমৃত সদৃশ স্বাদ সুবাসিত নীর॥
পাতাল ভেদিয়া বহে বহল বিস্তার।
তড়িত রঙ্গিনী গঙ্গা করয় জোকার॥
আছয় বিশেষ মৎস্য মগর কুম্ভির।
সর্ব্বদায় সঞ্চরয় সুবাসিত নীর॥
কমল কুমুদ নীল উত্পল যত।
ফুলি ফুলি আছে চিত্র বিচিত্র সমস্ত॥
সেহি গঙ্গা তীর্থক তীরত বিতোপন।
নগরেক আছে সীমা শতেক যোজন॥
চম্পায়নী নামে বস্তুয়ে সম্পূর্ণ।
সাক্ষাতে বুলিতে পারে ইন্দ্রর ভুবন॥ (পৃ ৬৬)

সেই যুগের মানুষ দিকশূল, শনি-মঙ্গলবার প্রভৃতি খুব মানিত। দুর্গাবরের কাব্যে তার খুব পরিচয় পাওয়া যায়। নৌকা নির্মাণে যাত্রা করিবার কালে চন্দ্রধর সাউধ দৈবজ্ঞ আনিয়া শুভাশুভ জানিয়া লইতেছেন।

শনিবার দিবসত পশ্চিমে সুসিদ্ধি।
উমার গমনে কার্য্য হৈবে সিদ্ধি॥ (পৃ ৬৭)

দুর্গাবরের কাব্য কতকগুলি সঙ্গীতের সমষ্টি। নানা রাগরাগিণীতে কাব্যখানি পরিপূর্ণ। তাহার মধ্যে ভাটিয়ালী, সুহাগ, রামগিরি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কাব্যখানি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত।

পদ্মাদেবীর মাহাত্ম্য সম্পর্কে কবি তাহার কাব্যে লিখিয়াছেন —

পদ্মাইক পূজিলে প্রত্যেক বর পাই।
অন্ধনার চক্ষুদান ঘরে ধন (ভরাই)॥
নিপুত্রির পুত্র হয় কুষ্ঠি মুক্ত হয় বাদী।

ঘরে ঘণ্টা পাতি যদি পূজায় প্রবন্ধি ।।
বরিষেক অন্তরে বারিষা সময়ত ।
চারিদিশ পূজিবেক শ্রাবণ মাহত ।।
দুই সংক্রান্তির দুই পঞ্চমী পূজিবা ।
পদ্মাই মন্ত্রসন্নে সুখত থাকিবা ।। (পৃ ১৬)

তখন মানুষের অভ্যর্থনা এবং মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের ত্রুটি ছিল না । বেহুলা লখীন্দরকে জীবিত করিয়া চম্পায়ানি প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সনকা —

দুয়ারে দুয়ারে পঞ্চ রুপিলা কদলি ।
মাতপুত্র সহিত আনিত গৈলা চলি ।।
সখি বুলি বেহুলাই বাক্য নিবন্ধিলা ।
তেতিক্ষণে কপাটর কুলুপ খুলিলা ।। (পৃ ১২৫)

সুকবি নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণের মত দুর্গাবরের বেহুলা উপাখ্যান কোন প্রাসঙ্গিক আখ্যানের দ্বারা ঘটনার গতি পদে পদে ব্যাহত হয় নাই । সেইজন্য দুর্গাবরের কাব্যখানি ঘটনার ঐক্য রক্ষা করিতে পারিয়াছে । কোন কোন অংশে দুর্গাবর এবং সুকবি নারায়ণদেবের বর্ণনার সাদৃশ্য দেখা যায় । উদাহরণস্বরূপ কালীনাগে লখীন্দরের রূপ দেখিয়া প্রত্যেক অঙ্গের রূপ বর্ণনা করা বিষাদময় কথাগুলি দুই কাব্যেই বিদ্যমান ।

দুর্গাবরের বেহুলা আখ্যানে মনকরের কাব্যের মতই সামাজিক অবস্থার চিত্র পাওয়া যায় । চান্দ সদাগরের সঙ্গে পদ্মাদেবীর বিবাদের চিত্রই পদ্মাপূজার প্রবর্ত্তন প্রথম অবস্থায় শাক্তগণের নিকট হইতে কেমন করিয়া বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার আভাষ দেয় । সেইরূপ চান্দ সদাগরের বাণিজ্যের কাহিনী প্রাচীন আসামের বাণিজ্যপথ, বাণিজ্যের বস্তু, মুদ্রার ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে কিছু আভাষ দেয় । প্রাচীন আসামের সামাজিক অবস্থা অধ্যয়ন করিতে হইলে মনসা কাব্যগুলি অপরিহার্য্য ।

নারায়ণদেব (সুকনান্নী)

দুর্গাবর ও মনকরের পরবর্ত্তী যুগের কবি হইলেও নারায়ণদেবকে শ্রেষ্ঠ মনসা কবি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি বিস্তারিত ভাবে ৫৫ হাজার শ্লোকে 'পদ্মাপুরাণ' (সুকনান্নী পদ্মাবতী) কাব্য রচনা করেন। এই গীতপ্রধান কাব্য কামরূপ, দরং ও গোয়ালপাড়া অঞ্চলে সর্বাধিক জনপ্রিয়। জনসমাজে সাধারণভাবে এই কাব্য সুকনান্নী (সুকবি নারায়ণী) নামে পরিচিত। বঙ্গদেশেও নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণের প্রচলন আছে এবং বাঙ্গালী লেখকগণ নারায়ণদেবকে বাঙ্গালী কবি বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাহাদের মতে নারায়ণদেব মৈমনসিংহ জেলার বোরগ্রামের মানুষ ছিলেন। তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন এবং তাহার পিতার নাম ছিল নরসিংহ। নারায়ণদেবের উদ্ভব কাল সম্পর্কে তাহাদের মধ্যে মতভেদ আছে, কাহারও মতে ত্রয়োদশ, কাহারও মতে পঞ্চদশ আবার কাহারও মতে ষোড়শ শতাব্দী; আবার কাহারও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ।

কিন্তু নারায়ণদেবের কাব্যের জনপ্রিয়তা, জনশ্রুতি, পুঁথির ভাষা, স্থানের উল্লেখ রীতিনীতি ও আবিষ্কৃত পুঁথির সংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহাকে অসমীয়া কবি বলিয়া মনে হয়। অধ্যাপক ড: সত্যেন্দ্রনাথ শর্মার মতে — "বঙ্গদেশত আজি লৈকে নারায়ণদেবর এখনও সম্পূর্ণ পুথি উদ্ধার হোৱা নাই আরু জনপ্রিয়তাও অধিক নহয়। সম্ভবত: অসমীয়া কবি নারায়ণদেবের পুঁথির কোন পাঠ উত্তর-পূব বঙ্গত কালক্রমত প্রচলন হয়। আরু কোনোবা অত্যুৎসাহী বঙালী নকলকারে মৈমনসিংহর বোরা গ্রামত নারায়ণদেবর নিবাসবুলি প্রক্ষিপ্ত ভাবে পুথিত পদ কেইটা মান সুমুৱাই দিয়ে।" ৬১

স্বর্গীয় ভারত চন্দ্র দাসের মতে সুকবি নারায়ণ দেব পুয়ালকুছীর বাসন্তরীয় ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং উক্ত পরিবারে এখনও নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ সংরক্ষিত রহিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে তিনি দরং-এর রাজা ধর্মনারায়ণের (১৬১৫ - ১৬৩৭) রাজত্ব কালের কবি। উক্ত অনুমান সত্য হইলেও তিনি সপ্তদশ শতকের আদিভাগের কবি ছিলেন। পুঁথির ভাষার দিক হইতেও নারায়ণদেবকে ষোড়শ শতাব্দীর আগের বলা যায় না।

বর্ত্তমান সুকবি নারায়ণদেবের যে পদ্মাপুরাণ প্রচলিত আছে তাহাতেও বহু প্রক্ষিপ্ত বিবরণ আছে সন্দেহ নাই। নারায়ণদেবের ভণিতার বাহিরেও জানকিনাথ, রঘুনাথ, চন্দ্রপতি আদি অনেকের ভণিতা রহিয়াছে। ওজা পরম্পরার হাতেও সুকনান্নী হয়তো অনেকখানি বিস্তৃতি লাভ করে। চন্দ্রপতি, জানকিনাথ ওজার নামও হইতে পারে। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই কাব্য একসময় অতি জনপ্রিয় ছিল। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপনে এই কাব্য যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। একসময় ইহার পদ পাওয়া বহু ওজা মুসলমান ছিল। এইরূপ মুসলমান ওজার হাতে পড়িয়া নতুবা সেই সম্প্রদায়ের শ্রোতা ও দর্শক-গণের উদ্দেশ্যেই "হাচান হুচেন" পালা এই কাব্যে সন্নিবিষ্ট করা হয়। অতি প্রাচীন কালে গণ পুরাণ-কথা ব্যাখ্যা কালে নিজের কথাও কিছু সন্নিবিষ্ট করিয়া যেরূপে মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদির কলেবর বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছিল সেইরূপে ওজা পরম্পরার হাতে সুকবি নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ বিস্তৃতি লাভ করে। চন্দ্রধর সাউধের আফিং (অসমীয়া শব্দ 'কানি') বিক্রয় করা কথা হইতে প্রক্ষিপ্ত কতদূর হইয়াছে তাহা সহজে অনুমেয়।

কোচবিহারের রাজকীয় গ্রন্থাগারে ১৬৭৫ শকে চন্দ্ররাম নামে একজন মানুষ নকল করা বিদ্যানাথ কবির রচিত পদ্মাপুরাণ একখানি সংরক্ষিত রহিয়াছে। উক্ত পুঁথিতে মধ্যে মধ্যে সুকবি বল্লভদেব নারায়ণের ভণিতাও আছে। কাব্যের ভাষা অসমীয়া বলিয়া প্রকারান্তরে ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত স্বীকার করিয়াছেন।

সুকবি নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে পদ্মার উৎপত্তি, চন্দ্রধর ও বেউলা-লখীন্দরের কাহিনীর সহিত বহু প্রাসঙ্গিক কথা পাওয়া যায়। সেইগুলির মধ্যে সৃষ্টিপাতন, কদ্রু বিনতার ক্রন্দন, অরুণ জটায়ুর জন্ম, সমুদ্র মন্থন, দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, বিষহরীর বিবাহ, আস্তিকের জন্ম, ধন্বন্তরী বধ, নেতার জন্ম, বিষহরীর কাণা হওয়ার কারণ, জালোমালোর কথা, চন্দ্রধরের বর লাভ, শঙ্খওজার কাহিনী, পরীক্ষিত বধ, উষা অনিরুদ্ধের প্রতি ইন্দ্রের অভিশাপ, পদ্মা ও যমের যুদ্ধ, হাচান হুচেন যুদ্ধ, চান্দের নওকায় বাণিজ্য ও দুর্দশা, বাণিজ্যপথে নানা বিপর্যয়, নেতার সহায়তায় পদ্মার চন্দ্রধরের উপর অত্যাচার, মৃত স্বামীকে ভেলায় লইয়া যাওয়ার সময় বেউলার পথে বিবিধ অমঙ্গল ইত্যাদি বহু অতিরিক্ত বর্ণনা পাওয়া যায় যাহা দুর্গাবরের কাব্যে পাওয়া যায় না।

সুকবি নারায়ণদেবের রচনায় প্রাচীন আসামের সামাজিক আচার ব্যবহার, ব্যবসা বাণিজ্য, বৈদেশিক বাণিজ্য, শিল্পকর্ম, সাজ-পোষাক, অলঙ্কার, আসামের বনজ সম্পদ, কুসংস্কার-অন্ধবিশ্বাস, মঙ্গলামঙ্গল বিচার, লোকবিশ্বাস সমস্ত কিছুরই আভাস পাওয়া যায়। সুকবি নারায়ণদেবের অভিজ্ঞতা ও সামাজিক জ্ঞানের পরিসর বিস্তৃত ছিল। সমাজের সকল দিক, প্রাচীন ঐতিহ্য ও কথার (Traditional Lores) সহিত তাহার সম্যক পরিচয় থাকার প্রমাণ সুকন্নাত্রীতে পাওয়া যায়। মনকর ও দুর্গাবরের রচনা অপেক্ষা নারায়ণদেবের কাব্যের ব্যাপকতা ও প্রাসঙ্গিক কথার আধিক্যই বিবিধ পরিস্থিতি ও বৈচিত্রপূর্ণ ঘটনা সংযোগ করিতে সুবিধা দিয়াছে, কিন্তু অন্য-দিকে আবার ইচ্ছানুরূপ কথা বৃদ্ধি করার জন্য মূল ঘটনা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কাব্য কাহিনী সংহতিপূর্ণ না হওয়ায় অনেক স্থলে মূল কাহিনীর সূত্র হারাইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে। সেই জন্য সুকবি নারায়ণদেবের এই কাব্যকে কাব্য না বলিয়া পুরাণ বলা হইয়াছে। যদিও পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ ইহাতে নাই, পুরাণ রচনার পদ্ধতিটি ইহাতে অনুসরণ করা হইয়াছে। কাহিনী আরম্ভ করিয়া তাহার উপর উপকাহিনী চাপাইয়া যাওয়ার রীতি পুরাণসমূহে লক্ষ করা যায়। কাব্য বা পুরাণ হিসাবে এই গ্রন্থকে উচ্চস্থান না দিলেও মধ্যকালীন আসামের সম্যক সামাজিক চিত্র ইহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে এবং তার মধ্যেই ইহার মূল্য নিহিত আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে আহোম বা কোচ শাসনের কোন প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত কাব্যে নাই। সোণকোষ, গদাধর নদী ও কামতাপুর নগরের কথার উল্লেখ যদিও আছে, তাহা হইতে রাজনৈতিক অবস্থা অনুমান করা যায় না।

সুকবি নারায়ণের রচনায় বিভিন্ন রসের সমাবেশ হইলেও বিশেষভাবে করুণ ও হাস্যরসের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। শৃঙ্গারাত্মক বর্ণনা স্বাভাবিক মাধুর্য্য হারাইয়া অশ্লীল স্তরে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নামিয়া গিয়াছে। সঙ্গীতসমূহ দুর্গাবরের গীতের ন্যায় মধুর অন্তরস্পর্শী না হইলেও পর্যবেক্ষণ শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মানব অনুভূতির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ নাই কিন্তু পরিবেশ ও পরিস্থিতির পুঙ্খা-নুপুঙ্খ বর্ণনা আছে।

নারায়ণদেবের চন্দ্রধরের মানসিক দৃঢ়তা ও অটল নিষ্ঠা প্রধানভাবে প্রকাশ পাইয়াছে পদ্মার সহিত সম্বন্ধের ক্ষেত্রে, এতদ্ব্যতীত অন্য বিষয়ে কখনও পদস্খলন না হওয়া আদর্শ পুরুষ বলিতে পারা যায় না। কোন কোন পরিস্থিতিতে তাঁহার যৌন দুর্বলতা, অপরিণামদর্শিতা ইত্যাদি চারিত্রিক খুঁত না থাকা নহে। নারায়ণদেবের শিব ভক্ত-বৎসল, ভাঙর ও কামপরবশ ; নারদ প্রপন্ড ; পদ্মা প্রতিশোধ-পরায়ণা, কৌশল যুক্তা ও উদার্য্যহীনা সঙ্কীর্ণমনা দেবী। বেউলার চরিত্রে কিন্তু নারায়ণদেব কোথাও ত্রুটি রাখেন নাই। তিনি চতুরা, নৃত্যগীতনিপুণা, কর্মকুশলা ও পতিব্রতা। বেউলার চরিত্র নারায়ণদেব যত্ন ও সহানুভূতির সহিত অঙ্কন করিয়াছেন।

অসমীয়া মঙ্গলকাব্য অনুযায়ী মনসা মূর্তির তালিকা

হস্ত	হস্তের গুণ		অন্যান্য বৈশিষ্ট্য							উৎস
	১	২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(ক) চতুর্ভুজা			ত্রিনয়না	সর্পালঙ্কারা	নাগযজ্ঞোপবীত পরিহিতা	পদ্মাসনা	রক্তবস্ত্র-পরিহিতা	তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণা	চতুঃ রাজহংস বাহনা	মনসা-কাব্য পৃ: ৪
(খ) দ্বিভুজা	পদ্মকরা	বরদা	কিরিটি-কুণ্ডলা	নাগহার পরিহিতা ও রত্না-লঙ্কারা	জটাজুট-সমন্বিতা	শিরচন্দ্র-বিভূষিতা	ত্রিনেত্রা	নয়ন পদ্ম-পত্রের ন্যায়	হংসারূঢ়া	মনসা-কাব্য পৃ: ৫
(গ)			নাগ-আসনা	নাগ-রসনা	অষ্টা-লঙ্কারা	কর্ণকুণ্ডলা	সর্পকুচ-আভরণা			মনসা-কাব্য পৃ: ১১
			হংস-বাহনা							মনসা-কাব্য পৃ: ১৫

আসামের মনসা ও মঙ্গল-কাব্যের মুখ্য চরিত্রের নামের তালিকা

উৎস	মনসা	চান্দসদাগর	সনকা	লখী-দর	বেহুলা	বেহুলার পিতা	বেহুলার মাতা
লোকমুখে	১। পদুমাই ২। বিষহরি ৩। পদ্মাবতী ৪। মাড়ৈ	চান্দসদাগর	সোনেকা	লখি-দর	বেহুলা	শাহে	
মনকর ও দুর্গাবর	১। তোতলা ২। গোঙা ৩। মানসাই ৪। পদুমাই ৫। পদ্মাবতী ৬। বিষহরি ৭। দিগপুরী	চান্দসদাগর	সোনেথা	লখি-দর	বেহুলা	শাহেরাজা	সুমিত্রা
নারায়ণ-দেব	১। বিষহরি ২। পদ্মাবতী ৩। ব্রহ্মাণী	চান্দসদাগর	সোনেকা	লখি-দর	বেহুলা	শাহেরাজা	সুমিত্রা

অসমীয়া মঙ্গলকাব্য অনুসারে মনসা পূজার সময়

মনকর —	১) চৈত্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী ২) বর্ষার চারিমাস যে কোন রাত্রি
দুর্গাবর —	১) শ্রাবণ মাসের যে কোন চারিদিন ২) শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসের সংক্রান্তি
নারায়ণদেব —	১) শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী ২) বিবাহ-অন্নপ্রাশন ইত্যাদি দশকর্মের দিন

পাদটীকা

১. Hambly, Wilfrid - Serpent Worship in Africa (1931) Nat History, Anthropol Series, 21 PP 1-85.

২. Ramona and Marries - Man and Snakes, London 1965, P 27.

৩. ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, মনসোপাখ্যান, ৪৫ অধ্যায়

৪. ভবেন নার্জি — বড়ো কাছারীর সমাজ আরু সংস্কৃতি, পৃ: ৭

৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য — বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস

৬. ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মিথিলার কবি "বিদ্যাপতি" ব্যাড়ী ভক্তিতরঙ্গিনী নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথি, সংখ্যা কে ৫৩১১

৭. ড: বিরিঞ্চি বরুয়া — সম্পাদিত - মনসা কাব্য। গুয়াহাটী ১৩৭২
আরু
ড: সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা

৮. দৈবচন্দ্র তালুকদার, সম্পা - সুকনান্নী পদ্মাবতী, গুয়াহাটী, ১৩৭২

৯. মনসা কাব্য — প্রাগুক্ত, পৃ ৯

১০. প্রাগুক্ত - পৃ ১০

১১. মনসা কাব্য — প্রাগুক্ত, পৃ ১৫

১২. মনসা কাব্য — প্রাগুক্ত, পৃ ৮৭

১৩. মনসা কাব্য — প্রাগুক্ত, দুর্গাবর অংশ, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৮

১৪. মনসা কাব্য — প্রাগুক্ত, মূল পুঁথির এই অংশে ফাঁক রহিয়াছে।

১৫. মনসা কাব্যের মূল পুঁথির এই অংশে ফাঁক রহিয়াছে।

১৬. মনসা কাব্য মূল পুঁথির এই অংশে ফাঁক রহিয়াছে।

১৭. সুকনান্নী — প্রাগুক্ত

১৮. Oldham, C.F. - The Sun and the Serpent, London, 1905, P. 47

১৯. Fergusson, J - Tree and Serpent Worship, London 1838, P. 244

২০. Encyclopedia of Religion and Sthics, Vol.XI, PP 411-412

২১. The Indian Antiquary - Vol. 29, P 90.

২২. Mc. Crindle, J.W. - Ancient India as described in Classical Literature, Westminster, 1901, P. 145.

২৩. Aple, V.M. - Social and Religious Life of Grihyasutra, P. 119-122, Bombay, 1954.

২৪. ঋগ্বেদ ৫।৪৪

২৫. Bhattacharya, B - Sadhan Mala, Vol.I, Borada 1925.

২৬. ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত এবং এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত — Vipradas's Manasa Vijaya, Introduction, P. XXXIV.

২৭. Roy, S.C. - Oraon Religion and Customs, P. 302-303.

২৮. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য — বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ৩য় সং, পৃ ১৮৭

২৯. চৈতন্য ভাগবতের "দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোনজন" স্মরণীয়।

৩০. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পুঁথিশালায় রক্ষিত মূল পুঁথির ফটোস্টাট কপি হইতে উদ্ধৃত।

৩১. ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন — বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সং, পৃ ১১০-১১১

৩২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৯১ পুঁথিতে হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত এই কবিতা পাওয়া গিয়াছে।

৩৩. ড: সুকুমার সেন — বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ ২৪৩

৩৪. ড: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় সং, পৃ ৯০

৩৫. প্রবাসী, ফাল্গুণ ১৩২৮।

৩৬. ড: সুকুমার সেন — বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ।

৩৭. ড: আশুতোষ ভট্টাচার্য — বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস।

৩৮. ড: সুকুমার সেন সম্পাদিত — Vipradas's Manasa Vijaya.

৩৯. প্রাগুক্ত পুস্তকের পৃষ্ঠাসংখ্যা

৪০. প্রাগুক্ত — ভূমিকা (P V) দ্রষ্টব্য।

৪১. বিপ্রদাস এই কাব্যকে ছয়বার 'মনসা বিজয়', নয়বার 'মনসা মঙ্গল' এবং একবার 'মনসা চরিত' বলিয়াছেন। পুঁথির সম্পাদক ড: সেন মনসা বিজয় নামটি গ্রহণ করিয়াছেন।

৪২. ড: সুকুমার সেন — বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ।

৪৩. তমোনাশ দাশগুপ্ত — সম্পা : নারায়ণদেব - পদ্মাপুরাণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪২, পৃ ১৭, ১৮

৪৪. ড: আশুতোষ ভট্টাচার্য — বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, ৬ষ্ঠ সং, কলিকাতা, ১৯৭৫, পৃ ২২৮

৪৫. হেমচন্দ্র গোস্বামী — অসমীয়া সাহিত্যের চানেকি, কলিকাতা ১৯৪২, ভাগ-২, পৃ ২।

৪৬. রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা - ১৩১৮, পৃ ৮০-৯৭, ১১০-১৪২, ১৩১৯ পৃ ৬১-৭৬

৪৭. অচ্যুতচরণ চৌধুরী — শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, শিলচর ১৩৪২, পৃ ৪, ১৮।

৪৮. প্রাগুক্ত

৪৯. রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা - ১৩১৮, পৃ ১১৩

৫০. প্রাগুক্ত ।

৫১. ড: দীনেশচন্দ্র সেন – বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সং, পৃ ৩১৫ ।

৫২. অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় – শ্রীশ্রীপদ্মাপুরাণ, বাইশ কবি মনসা, কলিকাতা, ৭ম সং, পৃ ২৭ ।

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৮০, ১১৪

৫৪. মোহিনী মোহন মৈত্রেয়, কবি জীবন মৈত্র, র.সা.পত্রি. ৪ (১৩১৬)পৃ ১১৩ ।

৫৫. ড: সত্যেন্দ্র শর্মা আরু ড: বিরিঞ্চি বরুয়া – প্রাগুক্ত, পৃ ৩ ।

৫৬. শ্রীযুত ভবানন্দ রাজখোয়া – এওঁর পরা প্রাপ্ত – 'মনসা সংগ্রহ' ।

৫৭. Whiethead, H - Village Gods of Southern India, P 26–30

৫৮. মনসা কাব্য – প্রাগুক্ত, পৃ ১ ।

৫৯. Vogel, J.P. - Indian Serpent Lore.

৬০. মনসাকাব্য – প্রাগুক্ত, পৃ ১

৬১. প্রাগুক্ত - পৃ ৪

৬২. প্রাগুক্ত - পৃ ৬৯

৬৩. প্রাগুক্ত - পৃ ৪ - ৬

৬৪. প্রাগুক্ত - পৃ ১১, ১৫

৬৫. গোয়ালপাড়া জেলার গৌরীপুর অঞ্চলে এই পূজা দর্শন করার সৌভাগ্য নিজের হইয়াছে ।

৬৬. মনসা কাব্য – প্রাগুক্ত, পৃ ৬, ৯, ১৬

৬৭. সুকনান্নী – প্রাগুক্ত, পৃ ১০৪, ১১২

৬৮. বিষয় চন্দ্র বিশ্বাসী – অসমীয়া সাহিত্যের রূপরেখা, ডিব্রুগড়, ১৯৮৩, পৃ ১১১ ।

৬৯. ড: সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা – অসমীয়া সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, গুয়াহাটী, ১৯৮১, পৃ ১২৩